পাইব? সে যে অজানা দেশ—"That undiscovered country from whose bourne no traveller returns." জড়াতীত লোকের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে শক্তির আবশ্যক, আমাদের ত তাহা হয় নাই। তবে অনেক মতের মধ্যে একটা মত (Theory) বলিয়া কথাটাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারি, এবং সেই মতটা কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহারই আলোচনা সম্ভব পর। দেখা যাক্, এমতের সপক্ষে বা বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ আছে।

প্রমাণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রমাণ-বিধি সর্ব্বত্র এক রূপ নহে। যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সর্ব্বদা শত শত কার্য্য করিতেছি, সে রূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আদালতে একটা মোকদ্দমার বিচার হয় না। তার জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ বিধির আবশ্যক। অধিকতর সতর্কতা সহকারে সে প্রমাণ গ্রহণ করিতে হয়। আবার, একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিচার কালে প্রমাণ-বিধি আরও সংকীর্ণ করিতে হয়, আরও বেশী সতর্কতা সহকারে অগ্রসর হইতে হয়। জটিল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা কালে অনেকটা নূতন ধরণের প্রমাণ বিধির প্রয়োজন। দার্শনিক তত্ত্বের বিচারের সময় অনেক স্থলে আমাদিগকে জড়ের রাজ্য ছাড়াইয়া যাইতে হয়, সুতরাং দার্শনিক অনুভূতি ও বিচার, উভয়ই অন্তর্মুখী। মনটাকে তখন বাহির হইতে টানিয়া আনিয়া ভিতরের দিকে পাঠাইতে হয়। এ ক্ষেত্রে আত্মবঞ্চনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক, সুতরাং প্রতি পদক্ষেপেই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কোন্‌টা পূর্ব্ব সংস্কার এবং কোন্‌টা প্রমাণসিদ্ধ সত্য, তাহাতে গোলযোগ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত কোন প্রমাণ চার্ব্বাক স্বীকার করিতেন না। তাঁহার সূত্র "না প্রত্যক্ষং প্রমাণম্।" অথচ জগতে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষের ভাগটাই বেশী। জড় জগতেও আমাদের প্রত্যক্ষের পরিধি অতি সংকীর্ণ। তাতে আবার মানুষের ইন্দ্রিয় গুলিও এত দুর্ব্বল যে, জড় জগতের যতটুকু অন্যান্য অনেক জীবের গোচরে আসে, আমাদের তাহাও না। যাঁহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, খুব বড় আওয়াজও আমরা শুনিতে পাইনা, খুবছোট আওয়াজও শুনিতে পাইনা। খুব কাছে এবং খুব মোটা জিনিষ না হইলে আমরা দেখিতে পাই না। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, Microphone প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা চক্ষু কর্ণের রাজ্য-পরিধি কথঞ্চিৎ বাড়াই বটে, কিন্তু তাহাও বড় বেশী নয়।

সাধারণতঃ যে জাতীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করি, সে সব নিম্নশ্রেণীর সত্য সম্বন্ধেই পযুজ্য। চরম তত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে সে জাতীয় প্রমাণ দ্বারা আমরা বড় বেশী সাহায্য পাইনা। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি সে সব প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গেলে কেবল বিতণ্ডা ও জল্পনাই সার হইয়া থাকে—সত্য আগেও যতদূরে ছিল, বহু বিতণ্ডার পরও ততদূরেই থাকে। এজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" তর্কে তার কি সাহায্য করিবে? অনুমানও ত প্রত্যক্ষ-মূলক। তবে আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে যাহা অতীন্দ্রিয়, কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহাও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে।

যাঁহারা এইরূপ চরম সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বলে। ঋষ ধাতুর অর্থ দর্শন। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রমাণের জন্য আমাদিগকে ঋষিদেরই বাক্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে, কারণ তাঁহারাই চরম সত্য দর্শন করিয়াছেন। এই খানেই জড় বিজ্ঞানবিদ এবং তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে মর্ম্মান্তিক প্রভেদ। জড় বিজ্ঞানবিদ্ বলেন, কিছুই বিশ্বাস করিও না, যে পর্য্যন্ত তুমি নিজে প্রত্যক্ষ না কর, অথবা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে তোমার প্রতীতি না হয়। আমরা দেখিতেছি যে, চার্ব্বাকও তাই বলেন। তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে ঠিক কথা, যতক্ষণ জড়ের কাছে, যতক্ষণ নিম্ন শ্রেণীর সত্য লইয়া নাড়াচাড়া কর, ততক্ষণ অপ্রত্যক্ষ বিষয় বিশ্বাস করিও না, অথবা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান দ্বারা যে সত্যে তোমার প্রতীতি না হইবে, তদতিরিক্ত কিছুই বিশ্বাস করিও না। কিন্তু সেই জড় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের বাহিরে গিয়া পড়িলে, অমনি তুমি নাচার। হাঁটুজল হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়, কিন্তু যেখানে সাঁতার জল, পায়ে মাটী ঠেকে না, সেখানে হয় সাঁতার দিতে হইবে, অথবা সন্তরণক্ষম বলিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথম প্রথম তাহার উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া জলে নামিতে হইবে। ক্রমে তিনিই তোমাকে সাঁতার শিখাইবেন, তখন এ অথাই জল তুমি নিজেই পার হইতে পারিবে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"—সংযতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, তৎপর হইতে হইবে, শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে, তবে জ্ঞান লাভ হইবে। অতীন্দ্রিয় চরম সত্যের জ্ঞান লাভের উপায় যুক্তি তর্ক নয়। তাহার উপায় শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। প্রথম অতীন্দ্রিয় সত্য বিষয়ক আপ্ত বাক্য শ্রবণ, তার পর সে বিষয়ে গভীর চিন্তা, তারপর নিবিষ্ট চিত্তে সেই সত্যের ধ্যান। সাধনার পক্ষে ক্রমে যতই অগ্রসর হইবে, ততই আলোক দেখিতে পাইবে, ক্রমে সম্পূর্ণ সত্যটা মনের ভিতর আপনিই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তখন Clairvoyance, Cluiraadience প্রভৃতি ক্ষমতা লাভ হইবে। যাহা অপ্রত্যক্ষের বিষয় ছিল, তাহাও প্রত্যক্ষের রাজ্যে আসিবে। প্রত্যক্ষের সীমা যতই বাড়িবে, অনুমান উপমানের সীমাও ততই বাড়িবে, কারণ অনুমান উপমানও প্রত্যক্ষমূলক। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ইহার কিছুতেই ধরা পড়ে না, সেখানে শাব্দ প্রমাণ ভিন্ন উপায় নাই। আপ্তবাক্যই উৎকৃষ্ট শাব্দ প্রমাণ। আপ্ত অর্থ বিশ্বস্ত ব্যক্তি, যিনি ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, যিনি ছল-কপটতা-বর্জ্জিত, প্রস্তাবিত বিষয়ে যিনি সর্ব্ববিৎ, শুদ্ধ জ্ঞান দান করাই যাহার বাক্যের উদ্দেশ্য এবং যাহার উদ্দেশ্যের চতুঃসীমায়ও কোন স্বার্থ বা গোড়ামির গন্ধ নাই। এমন লোকের কথায় বিশ্বাস না করিলে জ্ঞানের পথে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। শিশু যদি মাকে বিশ্বাস না করে, তবে তাহার ভাষা-শিক্ষাও হয় না। শিশুর কাছে মায়ের কথা আপ্তবাক্। তবে এরূপ বিশ্বস্ত ব্যক্তি কে, তাহা লইয়া মতান্তর সম্ভব। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আশা আছে যে, বৈদিক ঋষিগণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, Pythagoras, Plato ও বর্ত্তমান বহু জর্ম্মান দার্শনিকদের সঙ্গে একটা মতবাদ যদি বিশ্বাসও করি, তথাপি ভুলের আশঙ্কা কম। যেখানে নিজে পথ চিনি না,

সেখানে মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই পথ।

আমরা মানুষের একটা বাহিরের স্থূল দেহ ও ভিতরের সূক্ষ্ম দেহ কল্পনা করিয়া লই। এ দেশের শাস্ত্রে নরদেহের গঠন সম্বন্ধে যে প্রাচীন মত আছে, বিষয়টা পরিষ্কার বুঝিবার জন্য এস্থলে তাহার একটু উল্লেখ আবশ্যক। মানুষের রক্ত মাংসের যে দেহ আমরা সচরাচর দেখি, তা ছাড়াও তার অনেক গুলি দেহ আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এবং কোন কোন হিন্দু শাস্ত্রে এই দেহ গুলির সংখ্যা সাতটী। দেহস্থ আত্মার ৬টী আবরণ বা কোষ। বেদান্ত মতে এই কোষ সংখ্যা পাঁচটী। সংখ্যাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু পদার্থ একই। সচরাচর বেদান্তোক্ত কোষ গুলিই পরিচিত, সুতরাং তাহারই উল্লেখ করিব। স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মের দিকে গেলে সে গুলি

১। অন্নময় কোষ,
২। প্রাণময় কোষ,
৩। মনোময় কোষ,
৪। বিজ্ঞানময় কোষ,
৫। আনন্দময় কোষ।

কোন কোন বেদান্ত গ্রন্থ ইহার উপরেও আত্মার আর একটী ষষ্ঠ কোষ স্বীকার করেন, সেটীকে বলে

৬। হিরণ্ময় কোষ।

তারক রাজযোগিগণ এই কোষ গুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্থূলোপাধি, সূক্ষ্মোপাধি ও কারণোপাধি, এই তিন নাম দিয়া থাকেন। এই কোষ গুলি পেঁয়াজের খোসা অথবা কলার খোলার মত একটীর উপর আর একটী করিয়া সাজান নাই। এগুলি ওতপ্রোত ভাবে জড়ান, কারণ প্রত্যেকটাই ভিন্ন জাতীয় পদার্থ। স্পঞ্জ জল-সিক্ত করিলে যেমন হয়, খানিকটা সেইরূপ মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রাণময়,মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ আবার অন্নময় কোষ অপেক্ষা আকারে বড়। কদমফুলের কেশরের মত সে গুলিকে শরীরের বাহিরে ও এক জ্যোতির্ম্ময় আবরণের মত দেখা যায়। ইংরাজিতে এই আবরণকে aura বলে। যাঁহারা সাধন পথে অগ্রসর, অথবা অন্য কারণে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশালী (clairvoyant) তাঁহারা সকল মানুষেরই এই জ্যোতির্ম্ময় দেহ দেখিতে পারেন। অন্নময় কোষ আমরা সকলেই দেখিতে পাই এবং তাহাকেই সচরাচর দেহ বলিয়া জানি। মৃত্যু হইলে মানুষ যে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়, সে এই অন্নময় কোষ। দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে প্রাণময় কোষ বিবর্ণ হয়। বেদান্ত যাহাকে মনোময় কোষ বলেন, বৌদ্ধেরা তাহাকে কামরূপ বলেন। মধ্যযুগে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ তাহাকেই astral soul অথবা astral body বলিতেন। বর্ত্তমান সময়ে Theosophistগণও উহাকে astral body বলেন। আমাদের যত কিছু পার্থিব আসক্তি বা কামনা, তাহার বাস এই কোষে। বস্তুত কামনা-রাশির দ্বারাই এই কোষ নির্ম্মিত বলিয়া বৌদ্ধগণ ইহাকে কামরূপ বলেন। যাঁহাদের পার্থিব বিষয়ে আসক্তি কম, তাঁহাদের এই কামরূপ বা astral body অতি মনোহর স্বচ্ছ উজ্জ্বল বর্ণ। যাঁহাদের পার্থিব আসক্তি বেশী, তাঁহাদের এই কোষ গাঢ় মলিন বর্ণ, বাহ্যরূপ প্রায় অন্নময় কোষেরই মত।

মৃত্যুর পর অন্নময় কোষটী পৃথক্ হইয়া পড়িয়া থাকে, অপর কোষ গুলি পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনই থাকে। প্রাণময় কোষটী

মৃত্যুর অল্প পরেই পৃথিবীতে মিলিয়া যায়। থাকে কেবল মনোময, বিজ্ঞানময ও আনন্দময় কোষ-যুক্ত আত্মা। মোটা কথায, ইহাকে সূক্ষ্ম শরীব বলে। জীবিতাবস্থায় যত সংস্কাব, যত আসক্তি আমাদেব ভিতব প্রবেশ কবিয়াছে, সে গুলি সমস্ত বীজ ভাবে সূক্ষ্ম শরীবে থাকিযা যায।

শবীবং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বাযুর্গন্ধা নিবাশয়াৎ॥
গীতা ১৫।৮

বাযু যেমন পুষ্পাদি আধাব হইতে গন্ধ গ্রহণ কবিযা চলিযা যায, জীবাত্মাও সেই রূপ সর্ব্ব সংস্কাব ও আসক্তিব বীজ গ্রহণ কবিযা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন। পার্থিব আসক্তিব আধিক্য অনুসাবে মনোময কোষ বা প্রেত শবীব (astral body) অল্পাধিক কিছু কাল থাকিযা যায। ইহাকেই প্রেত-লোক-বাস অথবা ভুবর্লোক-বাস বলে। প্রাচীন গ্রীক ও বোমকগণ ভুবর্লোককে Purgatory বলিতেন। ভুবর্লোক বাসেব সময কোন কোন মৃত ব্যক্তিব প্রেত দেহ বা astral body বিশেষ বিশেষ অবস্থায কোন কোন জীবিত ব্যক্তিবও নয়নগোচব হয।

যেমন ভূলোকে একটা মৃত্যু আছে, সেইরূপ ভুবর্লোকেও একটা মৃত্যু আছে। তখন এই কামরূপ বা astral body একটা পবিত্যক্ত খোসাব মত ভুবর্লোকে পডিযা থাকে, আসল মানুষটী তাঁব ভিতব থেকে বাহিব হইযা যায়। তখনই তাব প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ বা কাবণোপাধিতে বাস হয। এই লোককে হিন্দু শাস্ত্রে বলে স্বর্লোক, বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলে দেবস্থান বা দেবাচান। বহুকাল মানবাত্মা এই লোকে বাস করে। যাঁহাদেব জীবনে অনেক সুকর্ম্ম, তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর এখানে বাস কবেন। গত জীবনেব দুঃখ কষ্ট তখন আব মনে থাকে না। এ শুধু আনন্দেব বাজ্য। দুঃখেব স্মৃতি ভুলিযা গেলে যে আনন্দ, এ সেই আনন্দ। দুঃখেব আত্যন্তিক নাশে অর্থাৎ নির্ব্বাণে যে আনন্দ, এ সে আনন্দ নহে। স্বর্লোকে সকলেই যায়, কিন্তু যাহাদেব কর্ম্মক্ষয় না হইযাছে, তাহাদেব মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ হয় না। মানবাত্মা এই স্বর্লোকে ক্লান্তি দূব কবে। জীবনেব কর্ম্মেব পব এখানে দীর্ঘ কালব্যাপী বিশ্রাম ও শান্তি। এখানে শুধু ক্লান্তি দূবই হয না। গত জীবনেব চিন্তা, অধ্যবসায ও সাধনাব ফলে ভাবী জীবনেব চবিত্র গঠন, সংস্কাব বা মানসিক প্রবৃত্তি ও মানসিক ক্ষমতা গঠন এই খানেই হয। তাব পব যথা সমযে পুনর্জ্জন্ম। তখন পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে একটা নূতন কামরূপ বা astral body গঠিত হয। সাধনাব ফলে যাহাব পার্থিব আসক্তি কিছু কমিযাছে, তাব astral body একটু উন্নত ধবণেব হয়। ভবিষ্যৎ জন্মে স্বভাবতই তাব পার্থিব আসক্তি একটু কম হইবে। যাব ভোগাসক্তি পূর্ব্ব জীবনে ক্রমেই বাডিতেছিল, পৃথিবীব ধনমানে যাহাব বলবতী স্পৃহা, তাব astral body তে আবও গভীবতব সাংসারিকতার ছাপ পডে। তার পব, যে দেশে, যে জাতিতে, যে পবিবাবে এবং স্ত্রী বা পুরুষ যে দেহে জন্ম গ্রহণ কবিলে প্রাবব্ধ কর্ম্মেব ফল ভোগ হইবে, সেই খানেই মানুষ শিশুরূপে আবার ভূমিষ্ঠ হয। পুনবায ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক। এইরূপ জন্মেব পব জন্ম এবং প্রতি জন্মেই ভিতবের মানুষ কিছু নূতন শিখে, এক ধাপ উপরে উঠে। এই রূপে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকে ক্রমাগত যাতায়াত করিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না মুক্তি

লাভ হয়। ইহাকেই বলে মানব আবর্ত্ত বা ব্রহ্ম-চক্রে ভ্রমণ। মুক্ত হইলে আর কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। মুক্ত পুরুষের শরীর ধারণ ইচ্ছাধীন। লোক শিক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে তাঁহারা সময় সময় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনারা এই কথা গুলি জোর করিয়া বিশ্বাস করিবেন, এমন ইচ্ছা আমি কথনই করি না। তবে একটা মত বা Theory রূপে সম্প্রতি এ কথাগুলিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে অন্যান্য যে সব মত জগতে প্রচলিত আছে, তাহার তুলনায় এটাই যেন একটু বেশী যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অনন্ত কলের তুলনায় মানুষের শতবর্ষ পরমায়ুও নিমেষ মাত্র। সহস্র প্রলোভন-পূর্ণ এবং সহস্র বাধা বিঘ্ন-সঙ্কুল এই সংসারে এইরূপ এক নিমেষের কাজের জন্য অনন্ত নরক বা অনন্ত স্বর্গের ব্যবস্থা আমার কাছে ত মোটেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত সত্য মিথ্যা জানিতে হইলে যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রয়োজন, তাহা আমাদের এখনও হয় নাই। তবে নিজে বুঝিনা বলিয়াই একটা কথা মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করা অনুচিত। যে বরফ দেখে নাই, সে যদি মনে করে যে, জল জমিয়া পাথরের মত হয়, একথাটা একবারে অবিশ্বাস্য, তবে তার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। যাহার এখনও নামতা শিক্ষা হয় নাই, সে যদি দশমিক ভগ্নাংশ না বোঝে, তবে গণিত শাস্ত্রে দশমিক ভগ্নাংশের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। মূঢ়বুদ্ধি আমরা যদি সৃষ্টিরহস্য না বুঝি, তবে সে দোষ কি সৃষ্টিকর্ত্তার? পাঁচ বৎসরের শিশু, যে নরনারীর প্রেম কি তা জানে না, সে যদি অভিজ্ঞান শকুন্তলের সৌন্দর্য্য না বোঝে, তবে সে দোষ কি কালিদাসের? মাঠের কোন কৃষককে যদি বলা যায় যে, তার শরীরের রক্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ জীবাণু বাস করিতেছে এবং অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, তাহা হইলে সে নিতান্ত অবাক হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু কথাটা যে মিথ্যা, তাহা বলার তাহার কোনই অধিকার নাই। সত্য বটে যে, এ ক্ষেত্রে তাহাকে একটা অণুবীক্ষণের সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে,তাহার রক্ত প্রকৃতই বহু জীবাণুর আবাস ভূমি, কিন্তু মানবের সূক্ষ্মদেহ দর্শনের জন্য যে অণুবীক্ষণের আবশ্যক, তাহা বাহিরের কাচে হয় না। সাধনা দ্বারা নিজের ভিতরেই সেটাকে গড়িয়া লইতে হয়। আমার তাহা নাই বলিয়াই কথাটা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া মূর্খতা।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা গেল যে, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ, এবং হিরণ্ময় কোষ, এই ত্রিকোষ-সমন্বিত আত্মাই মানুষের স্থায়ী অংশ বা আসল মানুষ। ইহাকে শাস্ত্রে সূত্রাত্মা বলা হইয়াছে। একই সূত্র যেমন বহু মুক্তার মধ্যদিয়া গমন করিয়া সেগুলিকে মালাকারে গ্রথিত করে, এই সূত্রাত্মাও, সেইরূপ, ক্রমান্বয়ে বহুদেহ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভ হইতে জীবের মুক্তি পর্য্যন্ত মানুষের একটা সম্পূর্ণ মহাজীবন গঠিত করে। অন্নময় কোষ (Physical body); প্রাণময় কোষ (Etheric double) এবং কামরূপ বা মনোময় কোষ (Astral body) এই তিনটী কোষ অস্থায়ী—প্রতিজন্মেই নূতন হয়। কর্ম্মফল ভোগের জন্য ইহাদের দ্বারাই আমাদের ভোগদেহ নির্ম্মিত হয়। ইহাদের দ্বারাই সংসারের সহিত আমাদের সম্পর্ক। কিন্তু

জড় দেহদ্বারা যে কর্ম্মই করি, জড়মস্তিষ্ক দ্বারা যে চিন্তাই করি, তাহারই একটা ছাপ ভিতরের মানুষের গায়ে সূক্ষ্ম শরীরে অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষের উপর গিয়া পড়ে। প্রত্যেকটী কর্ম্ম এবং প্রত্যেকটী চিন্তার ছাপ সেখানে গিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিবার আবশ্যক নাই এবং থাকেও না—তাহার জন্য পৃথক্ স্থান আছে,—কিন্তু তাহাদের সমষ্টিগত ফল যাহা, তাহা অতি পরিষ্কাররূপে সূক্ষ্মদেহের উপর মুদ্রিত হইয়া থাকে, এবং তাহারই ফলে আমাদের ভাবী জন্মের চরিত্র গঠিত হয়। কবে কি পদার্থটা আহার করিলাম, পাকস্থলীতে তাহার কোন চিহ্নই থাকে না, কিন্তু সেই খাদ্য হইতে আগত রক্ত মাংস যেমন শরীরের অংশীভূত হইয়া যায়, এও সেইরূপ। এইরূপে বহুজন্মের পর জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি হয়।

পুনর্জ্জন্মের সত্যতা সম্বন্ধে একটা প্রধান আপত্তি এই যে, পূর্ব্বজন্মই যদি ছিল তবে তার কোন কথা মনে নাই কেন? এ আপত্তির কয়েকটা উত্তর আছে। (১) সাধারণ মানুষের সম্বিৎ (consciousness) স্থূলদেহে অর্থাৎ অন্নময় কোষেই নিবদ্ধ। স্থূল শরীরের মস্তিষ্কে পূর্ব্বজন্মের কোন ঘটনারই স্মৃতি থাকিতে পারে না, কারণ সে মস্তিষ্কটাই নূতন—সে টা প্রতিজন্মেই নূতন হয়। যাঁহারা সাধনাবলে এতদূর অগ্রসর যে, তাঁহাদের সম্বিৎ (consciousness) ভূলোক বাসের সময়ও বিজ্ঞানময় কোষে কার্য্য করিতে পারে, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের কথা ইহজন্মের ব্যাপারের মতই ইচ্ছামাত্র স্মরণ করিতে পারেন, কারণ বিজ্ঞানময় কোষ চির পুরাতন, স্থূলদেহের মত জন্মে জন্মে নূতন হয় না। (২) স্মরণ না থাকিলেই তাঁহার প্রমাণাভাব সাব্যস্ত হয় না। কবে যে হাঁটিতে শিখিয়াছি, তাহা স্মরণ নাই, কিন্তু অনুমিতি ও উপমিতির সাহায্যে নিশ্চয় করিতে পারি যে, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়দিন পরে, বহু চেষ্টার ফলে হাঁটিতে শিখিয়াছি। যাঁহাদের খুব শিশুকালে অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন না যে, কবে কিরূপে তাঁহাদের বর্ণ পরিচয় হইল, কিন্তু জন্মিবার পরে যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবে যে মাতৃভাষা কহিতে শিখিলাম, তাহাও মনে নাই। বর্ত্তমান জন্মের ব্যাপার, যাহা বর্ত্তমান জড় মস্তিষ্কের উপরে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, তাহারই যখন এ অবস্থা, তখন যাহার মধ্যে একটা মৃত্যু ও একটা জন্মের ব্যবধান, সেই পূর্ব্বজন্মের ঘটনা স্মরণ না থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। যখন হাঁটিতে শিখিয়াছি, তখন কতবার যে আছাড় খাইয়াছি, তার ঠিক্ নাই, কিন্তু সফল ও বিফল বহু চেষ্টার সমষ্টিগত ফল যাহা, সেই হাঁটা ভালরূপই অভ্যস্ত হইয়াছে। বহু সফল ও বিফল চেষ্টার ফলে মাতৃভাষায় কথা বলিতে শিখিয়াছি। প্রত্যেকটী চেষ্টার বিবরণ মনে নাই, মনে থাকার আবশ্যকতাও নাই,—কিন্তু তাহাদের ফল যে মাতৃভাষা শিক্ষা, তাহা বেশ ভালই হইয়াছে। যখন দেখি, কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃই সুকবি, অপর একব্যক্তি কবিতার ধার মোটেই ধারে না, তখনই বুঝিব যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের কাব্য-সাধনার সমষ্টিগত ফল স্বরূপ তাঁহার ভাগ্যে বাগ্‌দেবীর অনুগ্রহ লাভ ঘটিয়াছে। এ অনুগ্রহ বাস্তবিক অনুগ্রহ নহে, এ সাধনার সিদ্ধি। যাহা পূর্ব্বজন্মে সাধনা ছিল, এ জন্মে তাহাই সিদ্ধিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। যাহা পূর্ব্বজন্মে পুরুষকার ছিল, এ জন্মে তাহা দৈবীশক্তিরূপে উদিত হইয়াছে। কত মানুষের

কত আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বলি যে, ওগুলি উহাদের স্বাভাবিক শক্তি। মনে ভাবি যে, পুঞ্জীকৃত এতগুলি শক্তির যে এক-স্থানে হঠাৎ অভ্যুদয়, তাহা বিধাতারই একটা মর্জ্জি। বাস্তবিক জগতে শক্তির উপচয়ও নাই, অপচয়ও নাই—জড়জগতেও না, আধ্যাত্মিক জগতেও না। কেবল শক্তি রূপান্তরিত হইয়াছে। বিশ্বের যিনি বিধাতা, যিনি সমগ্র সৃষ্টি বিচিত্র কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি কি এমনি যথেচ্ছাচারিতা করিবেন যে, তাঁহারই সৃষ্ট একজীবকে নিউটনের মস্তিষ্কে ভূষিত করিবেন, অপরকে কুড়ির বেশী গণিবার শক্তিও প্রদান করিবেন না। যাঁহারা শিক্ষক, তাঁহারা দিনরাত দেখিতেছেন যে, কোন একটা বিষয় দুইজন বালককে ঠিক্ একভাবেই বুঝাইয়া দেওয়া হইল, একজন বলিবামাত্র বুঝিল, আর একজন কিছুতেই বুঝিল না। এ কি বিধাতার পক্ষপাত? কখনই নহে। বিষয়টা প্রথম বালকের আগেরই জানা ছিল। সে কোন্ সুদূর অতীত কালে, কোন্ দেশে, কোন্ শরীরে উহা শিখিয়াছিল, কে বলিবে? কিন্তু জ্ঞানটা তার বিজ্ঞানময় কোষের ভিতর প্রচ্ছন্ন ছিল। শিক্ষকের কথা শুনিবা মাত্র তারে আঘাত পড়িল, যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। ওটা যে তার জানা কথার পুনরাবৃত্তি। দ্বিতীয় বালক এই সবে মাত্র কথাটা প্রথম শুনিতেছে, হঠাৎ তার আয়ত্ত হইবে কেন? কিন্তু আবার ঐ দুইটী বালককেই বাজারে কোন জিনিষ কিনিতে পাঠাও, প্রথমটী হয়ত ঠকিয়া আসিবে, দ্বিতীয়টী অল্পমূল্যে ভাল জিনিষ কিনিয়া আনিবে, কারণ সে কেনা বেচা আরও করিয়াছে, সে দোকানদারীতে পাকা হইয়াছে, যদিও এ জন্মে নহে। কথাটা বুঝিতে একটু সাবধানতার প্রয়োজন। মনে কর, কোন লোক স্বর্গীয় হরিনাথ দের মত অতি অল্প আয়াসে বহু ভাষা আয়ত্ত করিতেছেন। তাহাতে কি এই বুঝিব যে, তিনি ঐ বিশেষ বিশেষ ভাষা গুলিও পূর্ব্ব জন্মেও শিখিয়াছিলেন? তাহলে কথাটা ভুল বোঝা হইবে। প্রকৃত পক্ষে তিনি পূর্ব্বজন্মে এমন ভাবে মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছিলেন যে, নানা ভাষা শিক্ষার ক্ষমতা তাঁহার আশ্চর্য্য রূপে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শেকস্পীয়র, নিউটন, শঙ্করাচার্য্য, কালিদাস, আর্য্যভট্ট, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যত অসাধারণ ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা কি বিধাতার পক্ষপাতের ফল? মোটেই নহে। ৪ বৎসরের বালক মোজার্ট সঙ্গীতাচার্য্যদিগকে লজ্জা দিতেন। কলিকাতারও ৬ বৎসরের বালক মদন শত শত নর নারীকে তাহার কলকণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনিতে চিত্রার্পিতের মত করিয়া রাখেন। ইহারা কোথায় এ সঙ্গীত শিখিল? বিধাতা কি পক্ষপাতী? কৈ আমার গলায় ত একটা মোটা রাগিণীরও স্ফুরণ হয় না! পুনর্জন্ম স্বীকার না করিলে এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। এমন সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বের যিনি মালিক, তিনি পক্ষপাত জানেন না। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"। গী-৯-২৯। তিনি সর্ব্বভূতে সমান। তাঁহার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। জড়বাদী বলিলেন যে, এতো heredity, যে হেতু পিতা সুকণ্ঠ, মাতা সুকণ্ঠী, অতএব সন্তানও সুকণ্ঠ হইয়াছে। পুনর্জ্জন্মবাদী বলেন, ঠিক্, এ দেহ যন্ত্র, এই কণ্ঠ পিতামাতা হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু মোজার্ট কিম্বা মদনের এমনই প্রাক্তন কর্ম্মফল এবং তাহা ভোগের জন্য তাহার এমনি দেহ-যন্ত্রের আবশ্যক যে, ঐ পিতার ঔরসে এবং ঐ

মাতার গর্ভেই তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং তাহাই হইয়াছে। Genius যদি শুধু heridityরই ফল হইত, তা'হলে জগতে অনেক genius দেখা যাইত। শেক্‌স্‌পীরের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহাদের পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে আর কেহ কবি ছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। পরবর্ত্তী কালেও ঐ বংশে কেহ কবি হইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। মহাশক্তিশালী ব্যক্তিগণ অনেক সময় অজ্ঞাত নগণ্য-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই বংশ পরিচিত হয়। যদি পূর্ব্বেও ঐ বংশে কোন শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইত, তবে সে বংশ এত অজ্ঞাত থাকিত না। Heridity দ্বারাই যদি এ সমস্যার ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইত, তবে ধার্ম্মিকের পুত্র অধার্ম্মিক হয় কেন? পণ্ডিতের পুত্র মূর্খ হয় কেন? ঘোর সংসারীর বংশে সংসার-বিরাগী মহাপুরুষের জন্ম হয় কেন? একই পিতা মাতার সন্তানদের মধ্যে, এমন কি, যমজ ভ্রাতাদের মধ্যেও আকৃতিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও মানসিক এত পার্থক্য হয় কেন? Heridityতে সকল সমস্যার মীমাংসা হয় না। পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্ম ফলের ভিতর দিয়া দেখিলে এ জটিল সমস্যা অতি সরল হইয়া যায়।

স্থূল শরীর বাহন মাত্র, দেবতা-রূপী আসল মানুষ তার ভিতরে। স্থূল শরীর যন্ত্র, আসল মানুষ যন্ত্রী। সাধারণত জন্মে জন্মেই মানুষ কিছু কিছু করিয়া নূতন শিক্ষা লাভ করে, কিছু কিছু করিয়া উন্নত হয়। যন্ত্রীর অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত যন্ত্রেরও আবশ্যক, না হইলে সকল সুর বাজিবে কেন? বন্য অসভ্যের যে মস্তিষ্কে চলে, একজন রামমোহন রায়ের সে মস্তিষ্কে চলিবে কেন? ভিতরের মানুষ যে অনেক অভিব্যক্ত—অনেক বিকশিত হইয়াছে। যখন গাছকাটা পর্য্যন্ত ক্ষমতা লাভ হইয়াছে, তখন মোটা একখানা কুড়ালেই কাজ চলে। যখন সেই কাঠুরিয়া সুনিপুণ মিস্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে, তখন আর কুড়ালে চলে না। তখন তাহার নানাবিধ বিচিত্র ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের প্রয়োজন। যন্ত্রীর যখন যেমনটী আবশ্যক, যন্ত্রও সেইরূপ মিলিবে। ভিতরের মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও তদুপযোগী হইবে। ন্যায়বান্ বিধাতার ইহাই বিধান। তুমি যেটীর উপযুক্ত, তোমার তাই ঘটিবে, বেশীও না, কমও না।

অতএব মানবাত্মার বিকাশের জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন। যেমন মৃত্যুর প্রয়োজন, তেমন পুনর্জ্জন্মেরও প্রয়োজন। পুনরায় একটা যন্ত্র না পাইলে যন্ত্রী কি লইয়া সাধনা করিবে? কিরূপে সৃষ্টির অভিব্যক্তি হইবে? বন্য মানব কি চিরদিনই বন্য থাকিবে? তা'হলে আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হইল কৈ? যে মানবাত্মা এখন ঐ বন্য দেহের মধ্যে বাস করিতেছে, বহু জন্মান্তে সে মানুষই একটা গ্লাড্‌ষ্টোন্ বা কাণ্ট রূপে বিকশিত হইবে। যদি তাহাই না হইল, তবে বিশ্বসৃষ্টি ছেলে খেলার মতই নিরর্থক হয়। প্রাচীন ঋষিরা এই সত্যটাকে অতি পরিষ্কার রূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই বিশ্বকে তাঁহারা পদ্মের সহিত তুলিত করিয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কমলাসন। দিনে ফোটে, রাত্রে মুদ্রিত হয়। সৃষ্টির উষাকালে প্রথমে থাকে কলি, ক্রমে যত বেলা বাড়ে, ততই বিচিত্র বর্ণে ও মনোহর গন্ধে সহস্রদল ফুটিয়া ওঠে। যে আত্মা বন্য মানুষের শরীরে নিবদ্ধ, তাহাই ক্রমে দেবশরীর ধারণ করিবে। তখন এ কল্পের সৃষ্টিকাণ্ড শেষ হইবে। কীটাণুতে জীবনের প্রথম বিকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে স্বেদজ,

অণ্ডজ, জরায়ুজ, সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত হইতে হইতে মানুষ হইল। মানুষ বিকশিত হইয়া দেবতা হইল। তখন এ যাত্রার সৃষ্টিরও শেষ হইল। তারপর প্রলয়—ব্রহ্মার রাত্রি। আবার প্রভাত, আবার ব্রহ্মার দিন আরম্ভ আবার সৃষ্টি আরম্ভ, আবার পূর্ব্ববৎ অভিব্যক্তি, আবার পদ্মের বিকাশ। কোন্ অনন্ত কাল হইতে এ খেলা চলিতেছে, কে বলিবে?

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।

গী, ৮। ১৮, ১৯

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

গী, ৯। ৭

ব্রহ্মার দিবারম্ভে সৃষ্টির আরম্ভ। তখন মাতা অদিতি সূর্য্য ঠাকুরকে প্রসব করিলেন। তার পর কত গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি হইল, কত স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি হইল। শেষ সৃষ্টি মানুষ। লক্ষ লক্ষ জন্মের মধ্য দিয়া মানুষ বন্যপশুবৎ অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া জড়জগতের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিল। কত কত মহাদেশ উঠিল, মানুষের লীলা দেখিল, আবার ডুবিয়া সাগর গর্ভে লুকাইল। পৃথিবীর জল স্থলের অবস্থা এখন যাহা, বরাবরই তাহা ছিল না। ক্রমে মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী হইল, সাধনা দ্বারা দেবত্বে উন্নীত হইল, সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য সফল হইল। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহে যখন এই ব্যাপার হইয়া গেল, তখন আর এগুলি থাকার প্রয়োজন নাই। তখন সূর্য্য নিবিয়া গেল, গ্রহ উপগ্রহ পরমাণুতে পরিণত হইল, পরমাণু অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হইল। তখন সৃষ্টির এক অধ্যায় শেষ হইল, ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইল। যতবড় দিন, ততবড় রাত্রি। এইরূপ ক্রমাগত চলিতেছে—"ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।"

এই বিচিত্র সৃষ্টিতে জীবের সংখ্যা নাই। একবিন্দু জলকণার মধ্যে লক্ষ লক্ষ জীব। পৃথিবীর মত একটা গ্রহে কতগুলি জীব আছে, তাহা ভাবিতে গেলেও বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়। এইরূপ কত গ্রহ উপগ্রহ লইয়া একটা সৌর-জগৎ। সৌরজগৎই বা কত। এক একটী নক্ষত্র এক একটী সৌরজগতের কেন্দ্র। এক একটী সৌরজগৎকে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড বলে। সৌরজগতের আকৃতি অণ্ডের মত, তাই উহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত।

যথা তরঙ্গজলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপত্যোৎপত্যলীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥

যোগবাশিষ্ঠ।

"সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ, পরমেশ্বরের তেমনি বহু সৃষ্টি। বায়ুতে ধূলিকণার ন্যায় আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে।"

"লক্ষ্যন্তেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশোহ্যণ্ডরাশয়ঃ।" ভাগবত।

বিশ্বের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি লক্ষিত হইতেছে।

"সংখ্যা চেদ্ রজসামস্তি ন বিশ্বানাং কদাচন।"

দেবীভাগবত।

বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যায়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা করা যায় না।

"অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।"

ত্রিপাদ্ বিভূতি উপনিষদ্।

এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে এইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষিত্যাদি আবরণে আবৃত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

এ সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক শাস্ত্র বাক্য আছে।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের এক একজন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা চরমতত্ত্ব নহেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নহেন। তিনিও মায়াধীন, নচেৎ সৃষ্টি করিবেন কেন? তিনি জন্য ঈশ্বর, নিত্য ঈশ্বর নহেন।

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ।" ঋক্‌বেদ।

অগ্রে হিরণ্যগর্ভ বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ভূতগণের একমাত্র জাতপতি (জন্য ঈশ্বর)

"ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমো সম্বভূব।

বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।"—মুণ্ডক।

দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের কর্ত্তা ও ভুবনের গোপ্তা। *

অতএব ব্রহ্মা যখন নিত্য নহেন, তখন তাঁহার বিনাশও আছে, কারণ, যাহা উৎপন্ন, তাহা বিনাশশীল। ব্রহ্মার দিনরাত্রি কেমন ব্যাপার, তাত দেখিলাম। সকল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা সম্বন্ধেই এক কথা। আর্য্যঋষি সেখানেই থামেন নাই। তিনি ব্রহ্মার আয়ুও গণনা করিয়াছেন। যখন ব্রহ্মার রাত্রি, তখন পরা প্রকৃতিতে ভূর্ভুবস্বঃ এই তিন লোকের লয় হয়। যখন ব্রহ্মারও বিনাশ হয়। তখন কি হয়? — তখন তদুপরিস্থ মহ, জন, তপ ও সত্য, এই সব লোকেরও বিনাশ হয়। পরা প্রকৃতিরও বিনাশ হয়। প্রকৃতি তখন ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। আবার যখন নূতন ব্রহ্মার সৃষ্টি, তখন সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক হইতে সৃষ্টির আরম্ভ।

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

গী, ৮। ১৬

ব্রহ্মলোক অবধি সকল লোকই পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়। মহাপ্রলয়কালে তাহার বীজ পরব্রহ্মে লীন ছিল, সেই বীজ হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো," "না সতো সজ্জায়তে"—Nothing "কিছু না" হইতে সৃষ্টি হয় না, বীজ চাই। বীজ ভিন্ন কিছুরই উৎপত্তি হয় না। আবার অভিব্যক্তির আরম্ভ—সৃষ্টিপদ্মের ক্রম-বিকাশ। বিশ্বেরও পুনর্জন্ম।—কি বিরাট কল্পনা। কণামাত্র ভাবিতে চেষ্টা করিলে বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায় এই মহতী কল্পনা যাঁহাদের মাথায় খেলিয়াছিল, তাঁহারা কি আমাদেরই মত মানুষ?

ডারুইন ও ওয়ালেস্ বিলাতে অভিব্যক্তিবাদের আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহারা বলেন—বানর হইতে মানুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে। কথাটা একটু অসম্পূর্ণ হইল। বলা উচিত ছিল যে, বানরের শরীর হইতে মানুষের শরীরের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাঁহারা শুধু জড়ের দিক্ দিয়াই অভিব্যক্তিবাদ বুঝিয়াছেন। বাহিরের খোসাটার গঠন ক্রমে কিরূপে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং আরও পূর্ণের দিকে চলিয়াছে, তাহাই তাঁহারা দেখাইয়াছেন। ভিতরের মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাস অন্যরূপ। জড়ের অভিব্যক্তির ইতিহাস তাঁহারা যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, বোধ হয়, তাহাই ঠিক্। কিন্তু উহাত পূর্ণ অভিব্যক্তির ইতিহাস নহে; এ যে অত্যন্ত আংশিক। কতকগুলি অন্ধ হাতী দেখিতে গিয়াছিল। তাহারা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া হাতী দেখিল। কেহ মনে করিল, হাতীটা সাপের মত,—সে লেজে হাত দিয়াছিল। কেহ বুঝিল, হাতীটা থামের মত—সে পায় হাত দিয়াছিল। কেহ বুঝিল, হাতী কুলার মত, সে কাণে হাত দিয়াছিল। কেহ বুঝিল, হাতী দেয়ালের মত, সে গায়ে হাত দিয়াছিল। পুরাপুরি হাতীটাকে কেহ

* Vide ব্রহ্মতত্ত্ব by H N D

দেখিলও না, বুঝিলও না। Evolution বা বিবর্ত্তনবাদটাও জড়বাদী ইউরোপ সেইরূপ আধখানা বুঝিয়াছে। Hamlet অভিনয় হইয়া গেল, কিন্তু যুবরাজ Hamlet'ই রঙ্গমঞ্চে আসিলেন না। যজ্ঞ হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে যজ্ঞেশ্বরই নাই। এ যে দক্ষ যজ্ঞের মত শিবহীন যজ্ঞ। "Descent of man" লেখা হইল; কিন্তু, man-এরই সাক্ষাৎ নাই। আছে কেবল man-এর খোসাটা!

ভারতের অভিব্যক্তিবাদ প্রধানতঃ ভিতরের মানুষের অভিব্যক্তি লইয়া। ভিতরের মানুষ যেমন ফুটিয়া উঠিবে, তার বাসগৃহ-স্বরূপ বাহিরের খোসাটা, যেটা স্থূলদেহ, সেটাও তদুপযোগী হইবেই। কর্ম্মফল-ভোগের উপযুক্ত দেহ না পাইলে পুনর্জ্জন্ম নিরর্থক। পুনর্জ্জন্ম না হইলে সৃষ্টির বিকাশও অসম্ভব। অতএব, ভিতরের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও অভিব্যক্তি হইবে।

আর পুনর্জ্জন্ম কি শুধু মানুষেরই হয়? আমরা দেখিলাম যে, প্রাচীনদিগের মতে বিশ্বেরও পুনর্জ্জন্ম হয়। প্রত্যেক জলকণাটীর পর্য্যন্ত পুনর্জ্জন্ম হয়। যে জল-বিন্দু আজ সাগর হইতে বাষ্পাকারে উপরে উঠিল, তাহাই কালে মেঘের আকার ধারণ করে, বৃষ্টিরূপে ভূতলে পড়ে, নানা পদার্থের ভিতর দিয়া পুনরায় সাগরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থেরই এইরূপ চক্রাকার গতি। বিশ্বের প্রত্যেক অণু-পরমাণু এইরূপ ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করে। বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ। যেখান হইতে গতি আরম্ভ, চক্রাকার পথে আবর্ত্তন করিয়া সেখানেই পুনরাগমন। কিন্তু প্রত্যেক আবর্ত্তনেই একটু বিকাশ, একটু অভিব্যক্তি। যেমন গোল সিঁড়ি দিয়া ছাদে ওঠা। প্রাচীনেরা ইহাকে সর্প-কুণ্ডলীর সহিত তুলিত করিয়াছেন। সে সর্পের আদি-অন্ত নাই,—সে অনন্ত নাগ। প্রতি বসন্তেই বৃক্ষে পত্র হয়, আবার হেমন্তে পড়িয়া যায়। কিন্তু, বৃক্ষটা গত বৎসর যেমন ছিল, এবার তদপেক্ষা একটু অধিক পুষ্ট। প্রতি জন্মেই মানুষ নূতন দেহ ধারণ করে এবং প্রতি জন্মের অভিজ্ঞতার ফলেই ভিতরের মানুষ, যিনি সূত্রাত্মা, তিনি ধীরে ধীরে একটু পুষ্ট হন। ইহাই দেহ-ধারণের সাফল্য।

সংসারে যখন সুখ দুঃখের তারতম্য দেখি, যখন মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতার তারতম্য দেখি, তখন স্বতই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, সৃষ্টিতে কেন এ বৈষম্য? জগতের কি একজন বিধাতা নাই? যদি থাকেন, তিনি কি অন্ধ, তিনি কি যথেচ্ছাচারী? মানুষ রাজাও ত এত যথেচ্ছাচারী হয় না! বাস্তবিকই কি জগতে দুই জন ঈশ্বর আছেন? একজন মঙ্গলের ঈশ্বর ও একজন অমঙ্গলের ঈশ্বর বা "সয়তান?" তা হ'লে, আর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কোথায় রহিল? যদি একজন সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতাই থাকেন, তবে কেন সহস্র লোক প্রতিদিন দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে ও যুদ্ধে এত কষ্টে প্রাণত্যাগ করিতেছে? কেন মাতার কোল শূন্য করিয়া শিশু অকালে দেহত্যাগ করিতেছে? ঈশ্বর কি মানুষের কষ্ট দেখিয়া সুখ পান, বা কষ্ট নিবারণে তিনি অক্ষম? কেন মানব-উদ্যানের এতগুলি প্রস্ফুটিত সুগন্ধ-কুসুম সে দিন সাগর-গর্ভে ডুবিয়া মরিল,* আর আমরা কতকগুলি নিদর্ম্মালোক ধরার ভার বৃদ্ধি করিতে রহিয়া গেলাম? পরোপকারী পণ্ডিত কেন দরিদ্রের

* The wreck of the Titanic in April, 1912.

কষাঘাতে জর্জ্জরিত, আর দুর্জ্জন মূর্খের ভাগ্যে কেন রাজ্য-ভোগ? কেন জগতে সাধুর পতন, আর অসাধুর অভ্যুত্থান? বিধাতা কি নাই? তিনি কি অন্ধ? তিনি কি নিষ্ঠুর? যে সব অল্পবুদ্ধি ঔপন্যাসিক বিধাতার গুরুগিরি করিবার ধৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁহারা এক জীবনের একটা গল্পের ভিতরেই দুর্জ্জনের পতন ও সাধুর পুরস্কার বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করেন। ইংরাজী অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে Poetical justice বলে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অতটুকু ক্ষুদ্র মাপ-কাঠিতে বিধাতার কার্য্যের পরিমাপ করা চলে না। যাঁহারা এতবড় গুরুতর প্রশ্নটার সদুত্তর না দিয়া পাশ কাটাইতে চান, যে সব ভক্ত অন্ধ ভক্তিতে বিভোর, জগদ্ব্যাপারটাকে তলাইয়া দেখা অধর্ম্মের কাজ মনে করেন, তাঁহারা বলেন, এ সব ভগবানের লীলা, মানুষ কি বুঝিবে? ভারতের ব্রাহ্মণ এসব প্রশ্নের বিভীষিকায় মোটেই ভীত হন নাই। চিকিৎসা-বিদ্যার্থী যেমন খণ্ড খণ্ড করিয়া শবচ্ছেদ করিয়া, কোথায় কি আছে খুঁজিয়া বাহির করেন, তিনিও প্রশ্নটাকে যথাসম্ভব কাটিয়া ছিঁড়িয়া প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিয়া নানা দিক্ হইতে প্রশ্নটাকে দেখিয়া তার একটা সদুত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, বিনা কারণে কোন কার্য্যই হয় না। বিধাতার লীলা যথেচ্ছাচার নয়। বিধাতা কর্ম্মফল-দাতা। যেমন তোমার কর্ম্ম, তেমনই ফল তিনি তোমাকে দিতেছেন। তাঁহার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। তোমারই কর্ম্মের ফল তুমি ভোগ করিতেছ। ব্রহ্মাণ্ডে কোন শয়তান নাই, তোমার শয়তান তুমি নিজেই।

বীজ রোপণ মাত্রই গাছ গজায় না। আধ্যাত্মিক জগতেও তখন তখনই কৃতকর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয় না। কর্ম্মেরও একটা period of incubation আছে। উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত অবস্থায় কর্ম্মানুরূপ ফল ফলিবে; তেঁতুলের আঁটিতে তেঁতুল গাছই গজাইবে, আমের আঁটিতে আম গাছই গজাইবে। তুমি যে সুখ বা যে দুঃখ ভোগ করিতেছ,তাহার কারণ রূপ যে কর্ম্ম, তাহা যদি ইহ জীবনে না করিয়া থাক, তবে কোন অতীত জীবনে নিশ্চয়ই করিয়াছ। আজ যে কর্ম্ম করিতেছ, তাহার ফল যথা সময়ে তোমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি না চাহিলেও আসিবে। কর্ম্ম করিবার সময় তুমি স্বাধীন, কিন্তু যেই করিলে, অমনি বন্ধন। তোমার কর্ম্মফলে তুমি যতটুকু আবদ্ধ, ততটুকুই necessityর দাস। তদতিরিক্ত স্থলে তোমার Free will এর অব্যাহত গতি। এ দেশের ভাষায় বলিতে গেলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মই এজন্মে দৈব রূপে উদিত হয়। বাকীটা পুরুষকার। এ জন্মের পুরুষকারই ভবিষ্যৎ জন্মের দৈব।

যাঁহারা জড় বিজ্ঞান পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যেমন পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ শক্তিরও উৎপত্তি-বিনাশ নাই। একজাতীয় শক্তিই অপর জাতীয় শক্তিতে পরিণত হয়। শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। শুধু আছে, রূপান্তর ও ভাবান্তর। কখনও অব্যক্ত (Potential) কখনও ব্যক্ত (Kinetic)। এই তত্ত্বকে বিজ্ঞানে Conservation of Energy বলে। অব্যক্ত অবস্থায় যে শক্তি কারণ রূপে অবস্থিত, ব্যক্তাবস্থায় তাহাই কার্য্যরূপে প্রকাশিত। আবার এখন যাহা কার্য্যরূপে দেখিতেছি, তাহাই কারণ রূপে ভবিষ্যতে অপর কোন কার্য্য উৎপাদন করিবে। ভবিষ্যৎ কার্য্যের অব্যক্ত কারণ

রূপ বীজ বর্ত্তমান কার্য্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এখন যাহা দেখিতেছি, দুইটী জড় পদার্থের ঘর্ষণ বা মিশ্রণ, তাহাই কালে বিদ্যুৎ রূপে প্রকাশিত হইবে। এই বিদ্যুৎই আবার তাপে পরিণত হইবে। এই তাপই আলোকে পরিণত হইবে। এইরূপ জড়জগতে কার্য্যকারণের শৃঙ্খলা সহজেই চক্ষে দেখিতে পাই। জড়াতীত জগতেও শক্তির বিকাশ ঠিক্ এইরূপই। আজ যাহা কার্য্য, কাল তাহাই কারণ হইয়া অপর কার্য্য উৎপন্ন করে। যে শক্তি আজ প্রয়োগ করিলাম, তাহা জড়জগতেই হউক বা জড়াতীত জগতেই হউক, তাহার বিনাশ নাই। তাহার রূপান্তর ও ভাবান্তর হইবে, কিন্তু কখনও বিনাশ হইবে না। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা যদি একবার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, তবে আর কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

কর্ম্ম কথাটা বড় ব্যাপক। কর্ম্ম যে শুধু হাত পা ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারাই করা যায়, তাহা নহে। আমরা মনে মনে যে চিন্তা করি, তাহাও কর্ম্ম তাহারও ফল-ভোগ আছে। Commission যেমন কর্ম্ম, অনেক সময় Omission ও আবার সেইরূপ কর্ম্ম, তাহারও ফলভোগ আছে। কর্ম্মে যে শক্তি বা Energy প্রযুক্ত হয়, তাহার বিনাশ হয় না। তাহা সূক্ষ্ম কারণ-রূপে Potential বা অব্যক্ত ভাবে জমা থাকে। যথা সময়ে ফলরূপে ব্যক্ত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। অণু পরিমাণ একটু ক্ষুদ্র চিন্তারও বিনাশ হয় না। আমরা চাই বা না চাই, তার ফল আসিয়া আমাদের কাছে দেখা দিবে। এজন্মে না হয়, পরজন্মে আসিবে। পরজন্মে না হয়, শত জন্ম পরে আসিবে। হয়ত যে মূর্খ ছিল, সে জ্ঞানী হইয়াছে, অসাধু সাধু হইয়াছে, কিন্তু অসাধুর অবস্থায় সে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ যে ঘোরতর মানসিক কষ্ট, তা সেই সাধুর কাছেই শতজন্ম পর আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন মূর্খ লোকে বিধাতার দোষ দিবে ও বলিবে, হায় এমন সাধুরও সর্ব্বনাশ হয়।

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥

ভোগ ভিন্ন শত কোটি কল্পেও কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। যদি কল্প কাল মধ্যে কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, তবে কি হইবে? যখন ব্রহ্মার রাত্রি হয়, যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, যখন সৃষ্টি ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন কি হইবে? তখনও অভুক্ত কর্ম্ম অব্যক্ত ভাবে রহিয়া যাইবে। আবার যখন ব্রহ্মার উষাকালে সৃষ্টির আরম্ভ হইবে, তখন উপযুক্ত সময়ে সেই অভুক্ত কর্ম্মের ফলভোগ জন্য পুনরায় দেহধারণ করিতে হইবে, পুনরায় মানব-আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আবার ভূর্ভুবঃস্বঃ, এই তিন লোকে পর্য্যায় ক্রমে যাতায়াত করিতে হইবে।

তবে কি উদ্ধার নাই? এই ব্রহ্ম-চক্রই কি চিরদিন মানুষকে এমনি করিয়া পিষিবে? মহা নৈরাশ্য-পঙ্কে নিমগ্ন মানুষকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অভয় দিয়া পথ দেখাইয়াছেন। উদ্ধারের পথ আছে, কিন্তু সে পথ "ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া,দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"। এ যে বিষম সমস্যা। কি করিয়া পথে থাকা সম্ভবপর? ভোগ ভিন্নত কর্ম্মের ক্ষয় নাই। আবার ভোগের জন্য সেই নূতন দেহ ধারণ, অমনি কতকগুলি নূতন কর্ম্মও করিতে হইল। তাহার আবার ফল ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে জটিলতা ক্রমে বাড়িতেই চলিল। কোন পথে উদ্ধার? ক্রমে ঘন

ঘটাচ্ছন্ন অমানিশা। আলো কই? কি করিয়া পথ দেখিব?

আগে দেখা যাক্, কর্ম্মের ধাক্কাটা কোথায় আসিয়া লাগে। সে থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেই সে ধাক্কার হাত এড়ান যায়। কর্ম্ম ত শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে স্থান হইতে শক্তি চালানা হয়, ঠিক সেই স্থানে উলটা দিক হইতে সেই পরিমাণে একটা আঘাত লাগে। ইহাকে বলে শক্তির প্রতিক্রিয়া। কর্ম্ম শক্তির যে প্রতিক্রিয়া, তাহারই নাম কর্ম্মফল। আমি কর্ম্ম করিতেছি অতএব কর্ম্মফলটাও আমার উপর আসিয়াই আঘাত করিবে। কিন্তু এ "আমি" ত সত্য "আমি" নয়। যিনি আসল "আমি" আত্মা, তিনি ত নিষ্ক্রিয়। তিনি "সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" আমি করিতেছি বলিয়া যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, ইহা বাস্তবিক নকল "আমি"র কার্য্য—অহঙ্কারের কার্য্য। নকল "আমি" আসল "আমির" প্রতিবিম্ব, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আত্মা নহে। যখন এই কথাটা পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আর কর্ম্মের সঙ্গে অহং বুদ্ধি লিপ্ত হইবে না, এবং কর্ম্মফলেও আমার সুখ বা দুঃখ হইবে না। তখন আর কর্ম্মফল আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, কারণ কর্ম্মফল যাহাকে স্পর্শ করিবে, সে প্রকৃত পক্ষে "আমি" নয়। এই নকল আমিকে সাংখ্যদর্শনে "অহঙ্কার" বলা হইয়াছে। ইউরোপের দার্শনিকগণও ইহাকে চিনিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে বলেন, Empirical Ego or False Ego, as distinguished from the real Ego এই False Egoই কর্ম্ম করে। আমি করিতেছি বলিয়া যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, তাহা এই False Egoর। বাস্তবিক আত্মা বা Real Ego অকর্ত্তা। শারীরিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম্মই সত্ত্বরজস্তমো গুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রেরণায় সিদ্ধ হয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥
গীতা, ৩।২৭

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানাং অকর্ত্তারং স পশ্যতি॥
গীতা ১৩।২৯

যে অহঙ্কার প্রকৃতিরই বিকার, তাহাই কর্ত্তা। এস্থলে যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া মনে করি, তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মা নয়। যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্পণে পড়িয়া সূর্য্য বলিয়া ভ্রম জন্মায়, সেইরূপ, প্রকৃতির বিকার যে অহঙ্কার তত্ত্ব, তাহার উপরই আত্মার একটা প্রতিবিম্ব ফেলিয়া সেই প্রতিবিম্বকেই আসল বলিয়া মনে করি। ইহাই Lower Ego, বা Empirical Ego বা False Ego, Higher বা Real Ego নহে। ইহা চিদাভাস, চিন্মাত্র নহে। সাধারণতঃ অন্নময় কোষের যে চিদাভাস (যাহাকে brain consciousness বলে), তাহাই আমাদের নিকট আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়।"* "কর্ম্ম যে পাশরূপে পরিণত হইয়া জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কার বুদ্ধি। আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, তাহার সহিত আত্মার যোগ করিয়া দিই। আমরা ভাবি যে ঐ কর্ম্ম আমরা করিলাম।"† কাজেই ফল ভোগের জন্য এই বারবার ভূলোকে উদয় হয়।

যখন এই অহঙ্কার বুদ্ধি অর্থাৎ আমি করিতেছি, এই জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন

*"গীতায় ঈশ্বরবাদ" by H. N. D, P 242
† Do P44

আপনা হইতেই কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া আসে, কারণ আত্মাকে—আসল আমিকে—তখন আর কর্ম্মের সঙ্গে লিপ্ত করিয়া দেখিনা। সে অবস্থায় স্বার্থ কামনা কোথায় থাকিবে? সে অবস্থায় কর্ম্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না।

"যস্য নাহং কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"
গীতা, ১৮।১৭

যেখানে আত্মাকে কর্ম্মের সঙ্গে লিপ্ত করিয়া দেখিনা, সেখানে কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাও আমাদের থাকে না। জমিদারের নায়েব জমিদারী শাসন করেন, লাভ লোকসান জমিদারের। লক্ষটাকা মুনাফা বাড়িলেও নায়েব হর্ষে উৎফুল্ল হন না, জমিদারী নদী গর্ভে গেলেও শোকে ম্রিয়মাণ, হন না, কারণ তিনি ঐ জমিদারীর সঙ্গে আত্মাকে লিপ্ত করিয়া দেখেন না। যিনি সংসারে সর্ব্ব কর্ম্মে এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে নায়েবী করিয়া যাইতে পারেন, তিনি আর কর্ম্ম-পাশে আবদ্ধ হন না। যদিও তাঁর কিছু মাত্র স্বার্থ কামনা নাই, তথাপি, আমাদের কল্পিত নায়েব কিন্তু মুনিবের জমিদারী শাসনে কিছু মাত্রও অবহেলা করেন না, বরং তিনি যেমন জমিদারী শাসন করেন, জমিদার নিজেও হয়ত সেরূপ পারেন না। সকল কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিব, অথচ তাহার ফলের সহিত স্বার্থ-কামনা জড়িত করিব না, এ অতি কঠিন সাধনা। কিরূপে তাহা সম্ভবপর, গীতা তাহা নানা রূপে দেখাইয়াছেন।

সমস্ত কর্ম্মেই বন্ধন হয়, এই মনে করিয়া প্রাচীন কালে এদেশে কোন কোন সাধক সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-সন্ন্যাসী হইতেন। তাঁহারা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য কোন রূপ কর্ম্মই করিতেন না। ইহাদের সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—

"ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।" ১৮।৩

কোন কোন মনীষী কর্ম্ম দোষ-যুক্ত বিধায় বর্জ্জনীয় বলিয়া থাকেন। গীতা এমতের মোটেই পক্ষপাতী নহেন। গীতার মতে যাঁহারা কর্ম্ম ফলে অনাসক্ত, তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী, যাঁহারা সংসারত্যাগী তাঁহারা নহে।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।" ৩।১৯

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥" ৬।১

"সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।"
১৮।২

যস্তু কর্ম্ম ফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।" ১৮।১১

গীতা আরও বলেন যে, কর্ম্ম সন্ন্যাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, কারণ বাহ্যেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় করিয়াও মনে মনে কাম্য বস্তুর ধ্যান করা যায়। যাহারা এরূপ করেন, তাঁহারা মিথ্যাচারী (hypocrite)।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" ৩।৪

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"
৩।৬

মনে মনে যদি কর্ম্ম ফলে আসক্তি বর্জ্জন করা যায়, তবে সেই সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। কর্ম্ম করিতেই হইবে, নচেৎ শরীর-যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।"
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ গী, ৩।৮

কিন্তু সেই কর্ম্ম করিতে হইবে ফলাসক্তি বর্জ্জন করিয়া।

এইরূপ যে ফলাসক্তি-বর্জ্জিত, অহঙ্কার-বুদ্ধি-বর্জ্জিত কর্ম্ম, তাহা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে

অর্পণ করিতে হইবে। যাহা কিছু কর্ম্ম করিবে, —অশন, যজন, দান, তপস্যা—সমস্তই ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্॥গী, ৯।২৭

তন্ত্রেও আছে—

যৎকরোমি জগন্মাত স্তদেব তবপূজনম্।

যিনি প্রতিকর্ম্মেই মনে করেন যে, জগজ্জননীর পূজা করিতেছি, তিনি কেমন করিয়া কর্ম্মের মধ্যে নিজের নকল 'আমি'টাকে আনিবেন? কেমন করিয়া ভাবিবেন যে, আমিই কর্ম্ম করিতেছি? তখন তাহার সারা জীবনটাই একটা যজ্ঞে পরিণত হইয়াছে—স্বয়ং শ্রীহরি যজ্ঞেশ্বর। তখন সে নকল আমিটাকে তিনি ঐ যজ্ঞবেদিতে আহুতি দিয়া ফেলিয়াছেন। কর্ম্ম আর তখন তার কি বন্ধন করিবে? সেটাকে বন্ধন করা সম্ভবপর, সেই নকল আমিটা তখন ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

গীতার একটা কথা আছে যে, যজ্ঞার্থে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে জীব আবদ্ধ হয় না, অপরস্থলে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। ৩।৯" যজ্ঞের নিমিত্ত যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা সমস্তই বিলীন হয়, অর্থাৎ তাহার বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।"৪।২৩

এই যজ্ঞ কি? কত কথার অর্থ কালসহকারে বিকৃত হইয়াছে। অনেকস্থলে আসল অর্থের ঠিক্ উল্‌টা হইয়া গিয়াছে। এই যজ্ঞ শব্দটা তারই একটা। যজ্ঞ বলিলেই একটা অগ্নিকুণ্ড, কতকগুলি পুরোহিত, ধূপ, দীপ, ঘৃত, বধ্যমান ছাগশিশুর চীৎকার, ভৃত্যদের কলহ, বহু নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম, রন্ধনশালার প্রাঙ্গণে দেশশুদ্ধ-বালক বালিকা, কাক-কুকুর প্রভৃতির কোলাহল—এইসব চিত্র আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। যজ্ঞের আসল অর্থটা যে ত্যাগ, তাহা আমরা কোন্ দিনই ভুলিয়া গিয়াছি। বরং যজ্ঞের ইংরেজী অনুবাদ Sacrifice শব্দে এই ত্যাগের ভাব এখনও উজ্জল রহিয়াছে। গীতা-বাক্যের অর্থ এই যে, ত্যাগের বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে বন্ধন হয় না, কিন্তু ভোগের বুদ্ধিতে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই বন্ধনের কারণ হয়। ঈশোপনিষদের উপদেশ এই যে, ত্যাগদ্বারাই জগৎটাকে ভোগ করিবে। ত্যাগদ্বারা আবার ভোগ হয় কিরূপে? তাও হয় যখন নকল আমিটা ভস্মীভূত হইয়া যায়—যখন বিশ্বের স্বার্থে ও আমার স্বার্থে কোন প্রভেদ থাকে না। সে অবস্থায় ত্যাগে অনির্ব্বচনীয় সুখ হয়। বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তি তখন ভালবাসার জন হইয়া যায়। ভালবাসার জনকে কিছুই অদেয় থাকে না। বরং তাহাকে দিয়াই সুখ। মা যখন শিশুকে স্তন্যদান করেন, তখন মার যে সুখ, এ সেইরূপ সুখ। ত্যাগে যখন সুখ হয়, Sacrifice যখন দৈনিক ও সুখকর ব্যাপার হইয়া উঠে, তখনই আমরা যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিতেছি, বলিতে পারি। ত্যাগের বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, কারণ তখন কর্ম্ম নিষ্কাম হয়, কর্ম্মে অহঙ্কার-বুদ্ধি থাকে না, এবং তখন যা কিছু করি, যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মেই তাহা অর্পিত হয়। তখন ক্রমেই আমাদের দিব্যচক্ষু খুলিতে থাকে এবং ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে আরম্ভ করি। তখন সর্ব্বত্র শ্রীহরির রূপ দেখিতে পাই। মানুষ তখন রোগীর সেবা করিয়া মনে করে, ভগবানের সেবা করিলাম। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি

যখন আহারে বসে, গৃহস্থ তখন মনে করেন, স্বয়ং নারায়ণ আহার করিতেছেন। কর্ম্ম করিবার সময় যখন মানুষের সেইরূপ মনের ভাব হয়—ত্যাগ যখন সুখের কারণ হয়—তখনই কর্ম্ম কর্ম্মযোগে পরিণত হয়। সে কর্ম্মে আর বন্ধন হয় না। প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় নাই, সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিতেই হয়। কিন্তু ক্রিয়মাণ কর্ম্ম আর তখন সঞ্চিতের খাতায় জমা হয় না। কারণ, সে অবস্থায় সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পিত হইয়া গিয়াছে। সঞ্চিত যে কিছু কর্ম্ম থাকে,—যাহা এখনও প্রারব্ধ হয় নাই, ভবিষ্যৎ জন্মের জন্য জমা আছে,—তাহারও বীজভাব নষ্ট হইয়া তাহা ক্ষয়িত হইয়া যায়, কারণ, তখন ভগবদ্দর্শন হইয়াছে।

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

—মুণ্ডক।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঘোষ।

৩০শে আশ্বিন।

সেদিন এদেশে একটা মহা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী আদেশ করিলেন, রাখিবন্ধন করিও না,* সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, রাখিবন্ধন করিও।† কোন কোন পঞ্জিকায় ৩০শে আশ্বিন রাখি-বন্ধন গণিত হইয়াছিল, কোন কোন পঞ্জিকায় গণিত হয় নাই। পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত লিয়াকত হুসেন এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রাখি-বন্ধনের প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তবুও এবার দেশ ব্যাপিয়া, রাখিবন্ধন-উৎসব হয় নাই। ইহা নীরবতার লক্ষণ বলিয়া কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, কেহ কেহ বলেন, ইহা বাঙ্গালীর অপদার্থতার লক্ষণ। যিনি যাহাই বলুন, বাঙ্গালী জীবনের এক মহা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এ পরীক্ষা সকলের এখন প্রণিধানের বিষয় হইয়াছে। কত জনে কত রূপ কত কথা বলিতেছেন!

রাখি-বন্ধন এমন কোন একটা জিনিস নয় যে, তাহা ধরিয়া না রাখিলেই নয়। হাতে হাতে সূতা বাঁধিলেই "পর" কিছু আপন হয় না, প্রাণে প্রাণ বাঁধাই আসল জিনিস। রাখি-বন্ধন কেবল বাহিরের একটা ব্যাপার মাত্র। সংসারের ধর্ম্মের রাজ্যে গৈরিক ও তিলক ধারণ, উপবাস, নিরামিষ-আহার প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধনই যেমন চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, সংসারের একতার রাজ্যেও, তেমনই, নিমন্ত্রণ, মিলন, সঙ্গীত, রাখি-বন্ধন, পোষাক পরিচ্ছদের ঐক্যসাধন একমাত্র প্রয়োজনীয় নয়। ঐ সকল রাখিলেও চলে, না রাখিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ভিতর থাকিলেই বাহির থাকিবে। ভিতর-শূন্য বাহিরের কোনই প্রয়োজন নাই। আন্তর-সাধনের বহিঃপ্রকাশ যদি বহিরঙ্গ সাধন হয়, তাহাতে জীবের মঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে। এ সংসারে রিচুয়ালিজম ধর্ম্মের বহিরঙ্গ। রিচুয়ালিজমের প্রয়োজন নাই, কেহই তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্তর-শূন্য বাহ্য-রিচুয়ালিজমের কোন প্রয়োজন নাই। বাহিরে যাহা পূজা, অর্চ্চনা, উপাসনা; ভিতরে

* সঞ্জীবনী, ২৫শে আশ্বিন, ১৩১৯। কিন্তু রাখিবন্ধনের পরদিন সঞ্জীবনী সুরেন্দ্রবাবুর রাখি-বন্ধনের বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াছিলেন।

† বেঙ্গলী, ১৬ই অক্টোবর, ১৯১২।

তাঁহা যোগ, ভক্তি, সংযম। ঐ সকল মিলিত হইয়া মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। অন্তর-শূন্য বাহির কিছুই নয়, এবং বাহ্যপ্রকাশ ভিন্ন আন্তর-সাধনও মিথ্যা কথা। ভিতরে কিছু থাকিলেই বাহিরে প্রকাশ হইবে। ভিতরে তন্ময়তা যে লাভ করিয়াছে তাহার বদনে তাহা পরিস্ফুট হইবেই হইবে। ভিতরে যাহার প্রেম-বিহ্বলতা, সে অন্যকে দেখিলেই আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইবে। আলিঙ্গন, সম্ভাষণ, কোলাকুলি, সুমিষ্ট ব্যবহার, সদ্ভাব, এ সকলই প্রেম-সাধনের বহিঃপ্রকাশ, এ সকল বাহ্য-ভাব-অবলম্বন না করিয়া কেহই প্রেমিক হইতে পারেন না। সাধনার পথে অন্তর ও বাহির, দুই-ই চাই। দুই মিলিয়া এক, একে দুই। ভিতর ও বাহির চির এক সূত্রে বাঁধা। কিন্তু যেখানে ভিতর নাই, কেবল বাহির লইয়া নাড়াচাড়া, সেখানে সর্ব্বনাশ সমাগত। ভিতরে বল নাই, বাহিরের আস্ফালন, ভিতরে সংযম ও বৈরাগ্য নাই, বাহিরের নামাবলী ও গৈরিক ধারণ, ভিতরে প্রেম নাই, বাহিরের কোলাকুলিও আলিঙ্গন কখনও মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যাইতে পারে না। উহা তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে তুষ ভক্ষণ—উহা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অসার আচারের অনুসরণ। তাহাতে মানুষকে কখনও মুক্তির পথ দেখাইতে পারে না। প্রাণে প্রাণে মিল নাই, তবু হাতে সূতা বাঁধিয়া দিলাম, তাহাতে দোষ মঙ্গল আছে কি? যদি প্রাণে প্রাণে আমরা ভাই ভাই মিলিয়া থাকি, তবে রাখি না বাঁধিলেই বা ক্ষতি কি? যদি মিলিয়া থাকি, রাখি-বন্ধন থাকিলেই বা না কেন? রাখি-বন্ধন কি বঙ্গের একতার পূর্ব্বাভাস, একতার বহিঃপ্রকাশ নয়? রাখি-বন্ধন কি সূত্রে আসিয়াছিল, সকলেই জানেন। ইহার পুরোহিত এখন পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিলেও, ইহার ভিতরে যে একতার স্বর্গীয় একটা মহাশক্তি লুক্কায়িত ছিল, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ৩০শে আশ্বিন, এদেশের নব জাগরণের এক অলৌকিক সম্মোহন-মন্ত্র লইয়া আসিয়াছিল। সত্যই এই দিনে বাঙ্গালা জাগিয়াছিল। সত্যই বাঙ্গালীর অন্তর বাহির এই দিনে একাকার হইয়াছিল। সত্যই বিধাতা এই জাগরণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ রাখি-বন্ধন নবজাগরিত বাঙ্গালার অন্তরের প্রেম-বিহ্বলতার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যে আত্মীয়তা, যে সংযম, যে ত্যাগ-স্বীকার সে মিলন-মন্ত্রে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। তাহা স্মরণে পুণ্য, কীর্ত্তনে সুখ, অনুধ্যানে জীবন, অনুসরণে বিজয়া। উহা বাঙ্গালীর আঁধার ঘরের মাণিক, সাত রাজার ধন, অন্ধের যষ্টি; —বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব। উহা যদি স্মৃতি হইতে যায়,—বাঙ্গালার যাইতে আর কিছুই বাকী থাকিবে না।

জড় বিজ্ঞানের চক্ষে—সময়ও কিছু না, ঘটনাও কিছু না, অভিব্যক্তির পরিচ্ছেদও কিছু না। উহা অনন্ত কালই চলিতেছে ও ঘটিতেছে, উহার পরিচ্ছেদ বা বিরাম নাই। চলিতেছে চলুক, ঘটিতেছে ঘটুক, জড-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন। ইতিহাসজ্ঞ বলেন, সময় ও ঘটনাই উন্নতির উচ্চ সোপান। তাহার স্মরণে,- মননে নবজাগরণ আনয়ন করে। এজন্য ইতিহাস সকল ঘটনাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইতিহাস বলেন, থার্ম্মপলি, হলদিঘাট, চিলেনওয়ালা, প্লেবনা, সিদান, ওয়াটারলু প্রভৃতি শুধু স্থান নয়, উহা মানব-উত্থান-পতনের অপূর্ব্ব মন্ত্র-

কাহিনী। নানা সালকেও তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় মনে করেন। তাঁহারা বলেন, উকবিন্ন, জেরুজালেম, মক্কা, মদিনা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর মানব-কীর্ত্তি-মণ্ডিত অপূর্ব্ব স্বর্গের নিদান। তুচ্ছ কর—সব অসারের অসার তোমাকে নিশ্চেষ্টতার রাজ্যে লইয়া যাইবে। স্মরণ কর, তোমার ভাগ্যে নব-জাগরণ। ঈশা, মুসা, বুদ্ধ, মহম্মদ, নানক, শ্রীগৌরাঙ্গ কি বৃথাই আসিয়াছিলেন? তাঁহাদের কথা ভুলিয়া যাও, পতন তোমার জন্য উন্মুক্ত-দ্বার, স্মরণ কর, ঐ মুক্তির পথ তোমার জন্য চির উজ্জ্বল। রাণাপ্রতাপ, ম্যাটসিনি, সিজার, নেপোলিয়ান, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতিকে ভুলিয়া যাও, মরিয়াছে, আরও মরিবে, পরন্তু, স্মরণ কর—মৃত্যুময় প্রদেশেও জাগরণের মন্ত্র তোমার কর্ণে ধ্বনিত হইবে,—তোমাকে উন্নতির উপরে তুলিয়া ধরিবে। বিজ্ঞানের অনাদর কখনও পৃথিবীতে হইবে না,—বরং দিন দিন আদর বাড়িবে, কিন্তু জাতীয়তার ইতিহাসও বিশ্বমানব কখনও ভুলিবে না, চিরদিন তাহা উজ্জ্বল থাকিবে। জাতীয়তা বাড়ায় ইতিহাস। জাগরণ আনে ইতিহাস। তাহা কি জগতে কখনও অনাদৃত হইবে? কখনই নয়, কখনই নয়।

আমরা বলিতেছিলাম, ৩০ আশ্বিন। উহা কি শুভ মুহূর্ত্তে কি মঙ্গল সাধন করিতে আসিয়াছিল, জানি না, তাহা অলিখিত, হয়ত চির-অলিখিতই থাকিবে। কিন্তু তাহা স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে কি? যদি যায়, তবে সকলই যাইবে।

আমরা জানি, শুধু পার্টিসন রাখি-বন্ধনের কারণ নয়। বয়কটও তাহার অভিব্যক্তি নয়, শুধু পার্টিসন তাহার কারণ হইলে নব-পার্টিসনে তাহা গেল কেন? কোন্ পার্টিসন ভাল, সে বিচার কালজ্ঞগণ নির্ণয় করিবেন, এ স্থান সে বিচারের জন্য নয়। পার্টিসন তখনও ছিল, এখনও আছে,—আরো মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাভাষী তখনও বিভক্ত, এখনও বিভক্ত। উৎকল ও অসামীয় ভাষার সমীচীন পৃথক অস্তিত্ব আছে কি? বিশেষজ্ঞগণ জানেন, বাঙ্গালা ভাষা ও তাহা একই, অথচ তাহা বিভক্ত হইয়াছে। শ্রীহট্ট, কাছাড়, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, ছোট-নাগপুরের অধিকাংশ স্থান বাঙ্গালা ভাষাভাষী নয় কি? ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী পাইয়াছি, কিন্তু দিয়াছি কি? আসাম, উৎকল, বেহার, ভাগলপুর, ছোট-নাগপুর। বিনিময় কেমন হইয়াছে, আজও উত্তেজনায় কেহ কেহ তাহা না বুঝিলেও, এমন সময় আসিবে, যখন সকলেই তাহা বুঝিবেন। আর বিনিময়? কলিকাতা রাজধানী ছিল, আমরা একজন গবর্ণর পাইয়া রাজধানীর সে মহা গরিমা ও সম্মান ভুলিয়াছি। ভাল মন্দ কালজ্ঞগণ বিচার করিবেন। বাঙ্গালা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে—বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহাও কালজ্ঞগণ বিচার করিবেন। যদি পার্টিসনই শুধু রাখি-বন্ধনের কারণ হইত, তবে তাহা এমন করিয়া যাইত না। চির জাগ্রত ও চির উজ্জ্বল থাকিত। তবে গেল কেন? অন্যান্য বৎসর কত নেতা একাত্মক হইয়া রাখি-বন্ধনের বিজ্ঞাপন দিতেন। এবার তাহা করিলেন না কেন? এবার সুরেন্দ্রনাথ একাকী বিজ্ঞাপন দিলেন কেন? সকলে নবপার্টিসনে মহানন্দে বিভোর কেন? ভয়ে? না, জেদ রক্ষা হইয়াছে বলিয়া?

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এদেশের রাখি-বন্ধন, সমস্ত স্বদেশভক্তদের ন্যায়, তথাকথিত নেতাদের ভণীর প্রেমের বহিপ্রর্কাশ নয়; জেদ বা স্বার্থসাধনের বহিপ্রর্কাশ ছিল মাত্র। জেদ রক্ষা হইয়াছে, স্বার্থ-সাধিত হইয়াছে, আর

রাখি-বন্ধনকে নেতারা রাখিবেন কেন? সুতরাং তাহার অস্তিত্ব বায়ুতে মিলাইয়া গিয়াছে। জাতির জাগরণ বা উত্থান পতন লইয়া কে আর বৃথা মাতামাতি করিবে? স্বার্থান্বেষী, বাক্য-ব্যবসায়ী লোকের জেদ, বালকের আস্ফালন, হাতে চুষী-কাঠি পাইলেই তাহা তিরোহিত হয়। যাহা বালকের শোভা, তাহাই আজ প্রবীণের কৃত্য। বাঙ্গালাকে তাঁহারা গভীর হইতে গভীর তিমিরে ডুবাইয়াছেন।

কোন কোন নেতা বলেন, নীরবতা ভাল। বোম্বের লোকেরা ঠাট্টা করিয়া বলে, বাঙ্গালীরা বড়ই বাকাবাগীশ, কাজের বেলায় কিছুই নয়। তাহারা জানে না, শব্দ-ব্রহ্ম কার্য্যের নিয়ামক। যে নীরবতা মোহমায়া সুষুপ্তিকে ডাকিয়া আনে, তাহা কি চিরদিনই ভাল? যে ব্যক্তি মায়ায় সুষুপ্ত, ওঁ-ধ্বনিতে তাহাকে জাগাইবে না কি? যে আসন্ন বিপদে পড়িতে যাইতেছে, তাহাকে ডাকিয়া রক্ষা করিবে না কি? বাক্য—ব্রহ্মবাণী, ধ্বনিই ব্রহ্ম। তাহাকে তুচ্ছ করিতে পারে, এমন লোক এ জগতে কে আছে? ডাকার প্রয়োজন ছিল, তাই বাঙ্গালী সকলকে ডাকিয়াছে, তাই কংগ্রেস করিয়াছে, তাই বক্তৃতা-অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র সবই ত গিয়াছে, এক আছে ধ্বনি, বাণী, বক্তৃতা, তাহাও বন্ধ করিয়া নীরব হইতে বলিতেছ? এইরূপ "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল", স্বার্থ-ব্যবসায়ী নেতার হস্তে রাখি বন্ধনের ভার ছিল বলিয়াই রাখি বন্ধন গেল,—সোণার চাঁদ অসময়ে অস্তমিত হইল। নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ যে মুখে শিবাজী উৎসবে তিলকের সহিত মিশিয়া বক্তৃতা করিলেন, মুসলমান বাদ দিয়াই এদেশে একতা হইবে, তুর্কীর অবসানের দিনে লিয়াকতের সহিত মিশিয়া তাহারাই সেই মুখে বলিলেন, মুসলমান বাঁচাও। † রাখি-বন্ধনের দিনে যিনি গঙ্গাস্নান করিয়া আকাশ কাঁপাইয়া বক্তৃতা করিতেন, এখন তিনিই নীরব হইতে বলিতেছেন! বলিহারী বাহাদুরী!!

হুজুগ ভাল নয়, তাহা জানি, তাহা মানি; কিন্তু যেখানে কিছুই নাই, সেখানে সৎ কাজের হুজুগও ভাল। যেখানে কাজ নাই, সেখানে বক্তৃতাই ভাল। উহা যে শব্দব্রহ্ম।

বাঙ্গালার লোক সাধারণত নিদ্রাপ্রিয়, মায়া-মোহের গভীর সুষুপ্তিতে অনেকেই নিমগ্ন। যাহারা একটু একটু চক্ষু মেলিতেছে, তাহারা দেখিতেছে, চতুর্দ্দিকে কেবল থিয়েটার, ও রং তামাসা। কাগজে পড়িতেছে যা-তা বিজ্ঞাপন, দেখিতেছে কদর্য্য অর্দ্ধ উলঙ্গ মহিলার ছবি। চতুর্দ্দিকে চুটকি গল্প ও তরল সাহিত্যের ছড়াছড়ি। দেখিয়া শুনিয়া লোক সকল বিলাসিতা ও রিপুপরতন্ত্রতার দিকে দিন দিন ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। পরনিন্দা, কুৎসা, পরশ্রীকাতরতা দিন দিনই বাড়িতেছে। অহঙ্কার সকলকে আমূল গ্রাস করিতেছে। নাটক, উপন্যাস, প্রহসন ও থিয়েটারে কেবল রংতামাসা, কেবল পরনিন্দা, কেবল বিলাসিতার উপকরণ—বেশ্যার অঙ্গভঙ্গি। চতুর্দ্দিকে কেবল মন-ভুলানের চিত্র। বিজ্ঞেরা বলেন, দিন দিন ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হইতেছে। ছেলেরা দুর্নীতি-পরায়ণ হইতেছে, বৃদ্ধেরা কি নয়? প্রাচীন কাল হইতে চরিত্র-হীনতার দুর্জ্জয় প্রতাপ চলিতেছে। ছেলেদিগকে কিছু বলিলে, তাহারা উত্তরে বলে, "এদেশে এত বর্ণ-সঙ্কর জাতি কোথা হইতে আসিল? জাতি সকলের "ঋষি-গোত্র" কি রূপে উদ্ভূত হইল? উর্ব্বশী,

† Daily News, Oct 28, 1912

মেনকা ও রম্ভা প্রভৃতি দেবতাদিগকেও তপশ্চ্যুত কবিত। মনু অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ কেন অনুমোদন কবিলেন? বশিষ্ঠ কি শূদ্রাণী বিবাহ করেন নাই? পরাশর কি জেলেনী বিবাহ করেন নাই? * দেবতা ও যোগী-ঋষিদেব যখন পতন হইযাছিল, তখন আমবা কোন ছাব। এক এক কবিবা নাম কব, লোম বাছিতে কম্বলেব অস্তিত্ব লোপ পাইবে।" তাহাবা আবো বলে "এতগুলি থিযেটাব কি কেবল ছেলেদেব দ্বাবা চলিতেছে? এতগুলি বেশ্যা কি কেবল ছেলেদেব দ্বাবা জীবিকা পাইতেছে? বড় বড় ধনী, চরিত্র-হীনতাব বড় বড় জাহাজ।" প্রবৃত্তিব পথে মানুষ যত ধাবিত হয়, তত আবো প্রবৃত্তি ঘনাইয়া আইসে। নিবৃত্তি-সাধন যত কবিবে, ততই সংযমে সিদ্ধিলাভ হইবে। বাহিবে প্রবৃত্তিব এত আকর্ষণ যে, নিবৃত্তি সাধন এখন দিন দিনই অসম্ভব ব্যাপাব হইযা পড়িতেছে। নিবৃত্তি সাধনেব কোন উপায় ও সহায় নাই,—ধর্ম্ম সাধনের কোন রূপ ক্ষেত্র নাই। ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী পাণ্ডাদেব কথা বাদ দিলে, কোন ধর্ম্মেব চবিত্রবান বিখ্যাত উপদেষ্টা দেখিবে না, বৌদ্ধ-ধর্ম্মাঙ্কুর-সভা, হিন্দু-সৎসঙ্গ-সভা ও ব্রাহ্মসমাজ বাদ দিলে, নাম করা যায়, এমন কোন ধর্ম্ম-সভাও নাই। খ্রীষ্টান কলেজ বাদে সমস্ত স্কুল, কলেজ, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ, চরিত্র-শাসন-নিবপেক্ষ, নীতি-নিরপেক্ষ! ধর্ম্মের চর্চ্চা কোথাও নাই। ছেলেরা কোথায় ব্রহ্ম-চর্য্য শিক্ষা করিবে, বলত? টাকার খাতিরে স্কুল কলেজগুলি "নিজস্ব" বিক্রয় করিয়াছে! সে কালে কথকতা ধর্ম্ম-উপদেশ দিত, যাত্রা ধর্ম্মেব উপদেশ দিত, এখন সে সকল চিবকালের জন্য অন্তর্দ্ধান হইতেছে। এখন যাহা যাত্রা-নামে পবিচিত, তাহা থিয়েটাবেব পৌনঃপুনিক অভিনয়। অন্য দিকে থিয়েটাবেব নাচ, গান, নাটক, উপন্যাস, প্রহসন, বমণীব অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছবি সকলকে আকর্ষণ কবিয়া প্রবৃত্তিব পথে টানিতেছে। কৃষক এবং বণিকের পাট বেচা টাকায, এবং ধনীব অসদুপাযে উপার্জ্জিত অর্থে থিযেটাবেব উদব পূর্ত্তি হইতেছে। ছেলে বা বৃদ্ধ কিরূপে নিবৃত্তি সাধন কবিবে বল? কিসে মাতিযা ইন্দ্রিয-তাড়না ভুলিবে বল? টাকাব খাতিবে স্কুল কলেজেব বিশেষত্ব বিক্রীত, টাকাব মাযায পত্রিকা সকলে যা-তা বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে, টাকাব প্রলোভনে অসাব তবল সাহিত্যে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে,—আব বাস্তাব চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ উলঙ্গ মহিলাব ছবিময় বিজ্ঞাপন, বেশ্যাব আকর্ষণ, থিযেটাবেব আকর্ষণ, বেশ্যাব নৃত্য-গীত। নিবৃত্তিব পথে কে আকর্ষণ কাববে? বড বড় লোকেবা চবিত্র ডুবাইয়া স্রোতেব শৈবালেব ন্যায প্রবৃত্তিব পথে ভাসিযা যাইতেছেন। আর যুবকেবা? তাহাবা কি কবিতেছে, সকলে চক্ষু মেলিযা দেখিয়াও নীবব। মদ্যপান নিবাবণের জন্য এদেশে সভা হইযাছে, চরিত্র বক্ষাব জন্য কি কোন সভা হইতে পাবে না? ব্যভিচাবেব স্রোত হইতে দেশকে বক্ষা কবিতে কেহই কি অগ্রসর হইবেন না? মদ্যপান নিবাবণে বদ্ধপবিকর হইয়া প্যাবীচবণ অমর হইলেন, তামা-তুলসীর শপথেব বিরুদ্ধে চলিয়া বসিককৃষ্ণ অমর হইলেন, কলের শবদাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া রামগোপাল অমর হইলেন, নীলকরদের অত্যাচাব নিবাবণ-কল্পে হরিশ্চন্দ্র ও

* Indian Mirror—Inter-marriages—quoted in the Science-Grounded Religion, Oct, 1912, page 2

দীনবন্ধু অমর হইলেন, বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণ করিয়া বিদ্যাসাগর অমর হইলেন, কৌলীন্যের মেল ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাসবিহারী অমর হইলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা চালাইয়া আশুতোষ অমর হইলেন, কিন্তু হায়! ব্যভিচার ও চরিত্রহীনতা নিবারণকল্পে কেহই এদেশে অগ্রসর হইলেন না। এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। নেতারা ত টাকা ও যশের মায়ায় আত্ম-বিক্রয়ের পথ দেখিতেছেন। পাঁচকড়ি হীরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র এ সময়ে কি করিতেছেন? তাঁহারা ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি লোকের যশ বা নিন্দা ঘোষণা না করিয়া দেশকে ব্যভিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, নিশ্চয় তাঁহাদের নামও অমর হইবে। চতুর্দ্দিকে যে প্রবৃত্তির খেলা— নিবৃত্তিসাধনের সহায় কে? এ সমাজ, সে সমাজ সব প্রবৃত্তির স্রোতে শৈবালের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে।।

কার্য্যের স্রোতে ভাসিতে পারিলে রিপুর তাড়না লোপ পায়, মহাজনেরা বলেন। কিন্তু কাজ কোথায়? কি কাজ আছে, যাহাতে ছেলে বুড় মাতিয়া রিপুর তাড়না ভুলিবে, বল ত? গত কয় বৎসর স্বদেশী আন্দোলনে একটা মহা হুজুগ জাগিয়াছিল, তাহাতে সকলে একটু মাতিয়াছিল। তাহাতে মাতিয়া দেশের জন্য সকলে ভাবিতেছিল, খাটিতেছিল,—প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে অভ্যস্ত হইতেছিল। "স্বদেশী"র মহাশিক্ষা যে পাইয়াছে, সে-ই ধন্য হইয়াছে। কত কত যুবক স্ত্রী পরিবারের মমতা পরিত্যাগ করিয়া দেশের মায়ায় মাতিতেছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে প্রায় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা কি একটা সামান্য ঘটনা? স্বদেশী আন্দোলনে অসংখ্য নরনারী বিশ্ব-মানবত্বের আকর্ষণে মহা-জাতীয়তা সংগঠনে বদ্ধপরিকর হইতেছিল। সে হুজুগ—ছেলে খেলা নয়, তাহা স্বর্গের সোপান। সে হুজুগে প্রমত্ত হইয়া কত লোক সংযমের পথে চলিতেছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। যে জীবন-মায়া বাঙ্গালীর নিকট একমাত্র আকর্ষণের বস্তু, সে জীবনের মমতাও অতলজলে বিসর্জ্জন দিতেছিল! সে হুজুগ কি সামান্য হুজুগ? ডাকিবা মাত্র শত শত ভলণ্টিয়ার আজকাল কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, কে না জানে?—কত ক্লেশ, কত স্বার্থ-ত্যাগ—কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য তাহারা করিতে শিখিতেছিল। নেতাদের নীরবতায়, নিশ্চেষ্টতায়, স্বার্থ-সাধনের দৃষ্টান্তে, আজ সকলই পণ্ড হইতে বসিয়াছে—কয়বৎসরের মহা-সাধনা ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। ভাবিলেও প্রাণ অস্থির হয়।

কেন এরূপ হইল? কোথায় যেন কি গলদ লুক্কায়িত ছিল। কত রজনী কাঁদিয়াছি, মায়ের নিকট কাঁদিয়া কত প্রার্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"মা! কেন এরূপ হইল? দেশ ডুবিল সে কিছু নয়, দেশের প্রতি মহাজনদের কর্ত্তব্য গেল, সেও কিছু নয়, মা এ কি হইল?" মা বলেন, "স্বার্থ লইয়া কেহ কখনও মাতৃসেবা করিতে পারে নাই।" মা বলেন "স্বার্থ না ডুবাইলে মাতৃসেবা" হইবে না। মা বলেন—"সংযমের পথে আত্ম ও স্বার্থ বিলোপ করিয়া চলিয়া যাও, স্বদেশ উদ্ধার হইবে।"

স্বার্থের মায়া বিষম মায়া। কেহ ঘোরেন টাকার পশ্চাতে, কেহ ঘোরেন যশের পশ্চাতে, কেহ ঘোরেন রিপুর পশ্চাতে। ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কত কত মহাজন, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, ঐ সকল প্রবৃত্তির পথে দিবারাত্র ঘুরিতেছেন। যে মরুর মাধবে সাহারার

গোখলে অকৃতকার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ অকৃতকার্য্য, আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র ও রাসবিহারী অকৃতকার্য্য, এখন রামা শ্যামা লাটসভায় যাইয়া দেশের সেই মঙ্গল সাধন করিবেন! চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, এখন খদ্যোত আলোক বিতরণ করিবে॥ হায় রে দুর্ব্বুদ্ধি! যাহা পথ নয়, সেই পথেই মানুষ ধাইবে; যাহা শ্রেয় নয়, তাহাই করিবে, যাহা উপায় নয়, তাহাই অবলম্বন করিবে, যাহা বিধান নয়, তাহাই ধরিবে। পা-চাটা-দলের সকলেই সম্মান-স্বার্থ লাভের জন্য লাট সভায় যাইবার জন্য লালায়িত। স্বার্থ সাধনের সম্মুখে দেশ তুচ্ছ, চরিত্র তুচ্ছ। স্বার্থ ও রিপুর উত্তেজনায় যখন মানুষ মাতে, শুনিয়াছি তখন "আত্মীয় বন্ধু, "মা ভগ্নীও" তখন বিচার থাকে না। রাশি রাশি ঘটনা প্রতিনিয়ত প্রতিপন্ন করিতেছে, স্বার্থে যখন মানুষ উন্মত্ত হয়, তখন না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। ঐ দলের এত স্বদেশী লোক যে কতরূপে দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, উহা কিসের মায়ায় বল ত? পিতা, মাতা, ভাই, বোন, কিছুই তাহারা গণনা করিতেছে না কেন? শুধু স্বার্থের মায়ায়; পাছে রাজ-সম্মান যায়, এই ভয়ে। এক আর্য্যরক্তে শরীর ধারণ, এক মাতৃভূমির জল বায়ুতে জীবন-রক্ষা ও এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অম্লান চিত্তে, পরস্পরে পরস্পরের অহিত চিন্তা করিতেছে, পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে! যে আজীবন তাহার উপকার করিয়াছে, তাহার বুকেও অনায়াসে ছুরি বিদ্ধ করিতেছে। রিপুর দাস মুহূর্ত্ত পরে বরং সৎ হয়, স্বার্থের দাস চিরকাল সমভাবে চলে। এহেন স্বার্থের গোলাম, চরিত্রহীন পাণ্ডারা ৩০শে আশ্বিনের রাখি-বন্ধনকে রক্ষা করিতে পারিবে, ইহা মনে করাই ভুল হইয়াছিল। কৃত্রিম রকমের গুরু বুট্রা টমক্যাননের সহিত মল্ল যুদ্ধ করিতে চায় নাই, বলিয়াছিল, উহার কাঁচা হাড়। রাখি-বন্ধনকেও স্বার্থের কাঁচা-হাড় রক্ষা করিতে পারিবে না, বুঝা উচিত ছিল। যাহা হবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এদেশের মহা পরীক্ষা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এখন চির-ক্রন্দনই সম্বল।

মাতৃ-বিয়োগেও আমরা কাঁদিব না? চীৎকার করিব না?—সব নীরবে সহ্য করিব?

আমরা চরিত্র-শৈথিল্যের পক্ষপাতী নহি, উচ্ছৃঙ্খলাকে চিরদিনই ভয় করি, রিপু-চাঞ্চল্যকে চিরদিনই অগ্রাহ্য করি, অবাজকতাকে চিরদিনই ঘৃণা করি, রাজদ্রোহিতাকে চিরদিনই তুচ্ছ করি। যে রাজার প্রদত্ত উপকার অশেষ প্রকারে ভোগ করিতেছি, কল্যাণ দিবা রাত্রি গ্রহণ করিতেছি, সে রাজার বিরুদ্ধে চলাকে অধর্ম্ম মনে করি। রাজদ্রোহীকে চিরদিনই ঘৃণা করি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বদেশের কথা ভুলিতে পারি না। পরন্তু আমরা স্বদেশদ্রোহীকেও সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। স্বদেশ, সে যে আমাদের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট মাতৃ-পিতৃ ভূমি, ধর্ম্ম ভূমি, কাম্য-ভূমি, ঐহিকের মঙ্গল এবং পারত্রিক মুক্তির সোপান। স্বদেশ, সে যে আমাদের রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে, অস্থি মাংসের অণুতে অণুতে অনুস্যূত। স্বদেশের ক্রোড়ে জন্মিয়াছি, স্বদেশের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছি, স্বদেশের কোলে শুইয়াই দেহ ত্যাগ করিব। স্বদেশ, সে যে—ইহকালের স্বর্গ, এবং পরকালের বৈকুণ্ঠ; সে যে আমাদের সর্ব্বস্ব। কাহার মায়ায় আমরা তাহার কথা ভুলিব? কাহার ভয়ে তাহার মঙ্গল পদদলিত করিব? কাহার ইঙ্গিতে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিব? তাহা পারিব না। স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তা

লইয়া, রবার্ট এমেটের ন্যায়, ঋষি ম্যাটসিনি ও টলষ্টয়ের ন্যায়, জীবন বা সংসার বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই। বিধাতার নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা, স্বদেশের পুণ্য নাম ও স্বদেশের মঙ্গল কামনা লইয়া যেন, সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেহ ত্যাগ করিতে পারি।

সেই স্বদেশের সেই ৩০শে আশ্বিন, আমাদের সকল সাধনা-পূত, সর্ব্বকল্যাণের নিদান ৩০শে আশ্বিন, তোমরা ভুলিয়া যাও, আমরা ভুলিব না, কিছুতেই রাখি-বন্ধনের সহিত তাহাকে ভুলিতে পারিব না। রাখি-বন্ধন গিয়াছে, যাক্। যে "৩০শে আশ্বিন" এ দেশকে জাগাইয়াছে, এ দেশকে মাতাইয়াছে, এ দেশের প্রতি মায়া বাড়াইয়াছে, স্বদেশই যে সর্ব্বস্ব, এই কথা বুঝাইয়াছে সে "৩০শে আশ্বিন"কে কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। "স্বদেশ এবং ৩০শে আশ্বিন" মিলিয়া এখন এদেশের স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। উহার স্মৃতি যে দিন যাইবে, সে দিন স্বদেশও বিস্মৃতিতে ডুবিবে। বিধাতার নিকট এক মাত্র প্রার্থনা, "স্বদেশ এবং ৩০শে আশ্বিন" চির দিন স্মরণ্য এবং বরণ্য হইয়া থাকুক। বিধাতা এই করুন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, পৃথিবীর জাগরণের সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনার ন্যায় যেন, এই দিনের বিশেষত্ব, অনাহারের সংযম, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ সোণার অক্ষরে চিরদিন লিখিত থাকে। চিরকাল যেন ঘরে ঘরে এই দিনে স্বদেশের পূজা হয়। জাগরণের এই দিন চির উজ্জ্বল হউক, চির মহিমান্বিত হউক। তিনি এই করুন, ভারত-সতীর ললাটের প্রেমের এই রক্ত-চিহ্ন যেন চির উজ্জ্বল থাকে। রাখি-বন্ধন গেল ও চিরদিন যেন সন্তানগণের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমবন্ধন অক্ষয় হয় এবং এই পথ ধরিয়া জাতীয় একতা যেন ভারতে অবতীর্ণ হয়।

অরন্ধন ও রাখি-বন্ধন।

লোক কথায় বলে "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" মানুষেই প্রতিজ্ঞা করিয়া রক্ষা করে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া মানুষ, মানুষ হয়, জাতিও বড় হয়। যে জাতি বা যে জনসম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা রক্ষায় পশ্চাৎপদ, এ নিত্যসংগ্রামপূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? ১৩১৩ সালের (১৯০৫) ৩০শে আশ্বিন,প্রাতঃকালে, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর হাতে রাখী বাঁধিয়া যে প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইয়াছিল, আজ বাঙ্গালীর সে দারুণ প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজ দেশ বিদেশ, আজ ইংরাজ বাঙ্গালী সকলেই বলিতেছে "সেইত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি"।

বাঙ্গালা দেশটাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লর্ডকর্জ্জন বাহাদুর দেশের এমন কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, আর রাজরাজেশ্বর শ্রীযুক্ত ভারত-সম্রাটের এক ফুৎকারে সেই ভঙ্গ বঙ্গ জোড়া লাগাতেই বা কি বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহাত তলাইয়া দেখিলে অতলস্পর্শ বলিয়াই মনে হয়। কোনও মহামূল্য বস্তু ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তু লাভ দূরের কথা, দুটা বাজে ঝিনুকও পাওয়া যায় না। তোমরা ভাঙ্গা বাঙ্গালা জোড়া লাগা-ইতে বলিয়াছিলে, মহামহিমাময় সম্রাটপ্রবর তাহা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া লাভ লোকসানের অঙ্ক অনু-সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। প্রথম

তোমরা হাসিয়া আটখানা। এটা কি আত্ম-প্রবঞ্চিত বঞ্চকের হাসি নহে?

দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া যে জাতির নায়কদল বঞ্চনা-ব্যবসায়ে পরিপক্কতা লাভ করিয়া আত্মবলি ও স্বদেশের স্বার্থ-বলি দিয়া আসিতেছে, তোমরা তাহাদেরই উত্তরসাধক মাত্র। তোমাদের নিকট ইহার অধিক আর কিছু আশা করা নির্ব্বোধের কাজ, সন্দেহ নাই। তাই বলি, এ অধম নায়কদল জাতিটাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে দিবে না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আশ্বিন যে মাতৃ পূজার পুরোহিত সাজিয়া দেশনায়ক হইয়াছিলে, সে কি কেবল বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য? না, তাহার পশ্চাতে আর কিছু মহত্তর ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল? সে দিন কি তোমরা এ কথা বল নাই যে, আর পরের দ্বারস্থ হইবে না, কাঁদিতে হইলে, ঘরের লোকের গলা ধরিয়া কাঁদিবে? "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" না থাকিয়া "ভাই ভাই এক ঠাঁই" হইবে? সে মহাব্রতের উদ্‌যাপন-অনুষ্ঠান কি সম্পন্ন হইয়াছে?

সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, অনাথবন্ধু, আনন্দচন্দ্র, অম্বিকাচরণ ও মতিলাল প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরিত এক রোকা জারি হওয়াতে বিগত ছয় বৎসর জাতীয় কল্যাণ স্মরণ জন্য "অরন্ধন ও রাখি-বন্ধন" হইয়া আসিতেছিল। এবার কি এই সকল মহানুভব ব্যক্তির স্বাক্ষরিত কোন পরোয়ানা জারি হওয়াতে "অরন্ধন ও রাখি-বন্ধনের" গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইল? ইঁহারা হুকুম জারি করিয়া জাতীয় ব্রতের সূচনা করিয়াছিলেন, ইঁহারাই কি আবার তাহা বন্ধ করিলেন? ঐ সকল মহাত্মা ব্যক্তি এ দেশের লোকের সরল বিশ্বাসজড়িত সংস্কারের উপর এই হুকুম জারি করিয়া আত্ম-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আজ সেই সুপ্রবীণ সপ্তরথী মিলিত হইয়া চুপে চুপে সপ্তম বর্ষীয় শিশু জাতীয়-জীবনের নিধন সাধনে অগ্রসর হইলেন, আজ এই শিশু জাতীয় জীবনের প্রাণ রক্ষায় একটী প্রাণীও অগ্রসর হইল না। বঙ্গসুভদ্রার বালক-অভিমন্যু কলঙ্ক-কালিমা-মণ্ডিত কুরুপ্রবীণগণের কুমন্ত্রণায় কালের ক্রোড় আশ্রয় করিল, আজ বাসুদেবশিষ্য অরবিন্দ ও বিপিন চন্দ্রও এই জাতীয়-জীবনরূপ শিশুর নিধন সাধন স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াও নীরব ধ্যান ধারণায় ব্যস্ত। এই বেওয়ারিশ দেশে জাতীয় জীবন-শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন জন্য অভিভাবকতা করিতে, নরম গরম বা মধ্য ও চরম পন্থীদলে কি না কলহ। এরা বলে আমরাই ঐ শিশুর মা বাপ, ওরা বলে, যেই মা বাপ হউক, ওটা আমাদের কলমের চারা। যতক্ষণ জিনসটা ছিল, ততক্ষণ উভয়দলের যে কলহ কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহার তীব্র জ্বালা দেশের লোক এখনও সহ্য করিতেছে, আর মাঝখান হইতে কেমন সহজে এ জাতীয় জীবনের চিত্র-পট হইতে ঐ মহামূল্য বস্তুটী—ঐ সাতরাজার ধন মাণিক চুরি হইয়া গেল, কেহই দেখিল না। কেহ রক্ষা করিল না, এই হইল বাঙ্গালীর ধাত্।

ভারতের অন্যান্য জাতি ও বিদেশীয়গণ বলেন "বাঙ্গালী অত্যন্ত বুদ্ধিমান।" আর আমি কবির সঙ্গে একমত হইয়া বলি, এমন "অধম" ও নির্ব্বোধ জাতি মর্ত্ত্যপৃষ্ঠে আর কোথাও নাই। এত বড় একটা কঠোর বাক্য বলিয়া নীরবে অন্য কথায় অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, খুলে বলাই ভাল। অরন্ধন ও রাখি-বন্ধন এই দুটাই এদেশের বিশেষ অনু-

ষ্ঠান। একটী প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন, আর একটী শ্রাবণের পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ দুটীই জাতীয় পার্ব্বণ। এ দুটীই পঞ্জিকাভুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান-জড়িত সামাজিক ক্রিয়া। দেশের বর্ত্তমান নায়কদল জাতীয় ধর্ম্মাচারে সম্পূর্ণরূপ দায়িত্ব-জ্ঞানবিহীন মানুষ। ইঁহারা যখন ৩০শে আশ্বিন তারিখকে জাতীয় জীবনের বিশেষ দিন বলিয়া ঘোষণা করেন, ইঁহারা যখন ঐ দিনটীকে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে পরম পবিত্র দিন বলিয়া দেশের লোককে শিক্ষা ও দীক্ষা দেন, এবং ঐ দিনটীকে বিশেষ দিন বলিয়া দেশের পঞ্জিকাভুক্ত করিতে উপদেশ ও আদেশ দেন, তখন তলাইয়া দেখিলেন না যে, হিন্দুর গার্হস্থ্যজীবন যাপনের পক্ষে পঞ্জিকা একটী প্রধান সম্বল। বার, তিথি, মাস, তারিখ ইত্যাদির শুভাশুভের সহিত হিন্দুজীবনের সংস্কার আজও দৃঢ় ভাবে জড়িত, পঞ্জিকা-সম্বল হিন্দুর সংস্কারে ৩০শে আশ্বিনকে এক পবিত্র স্মরণীয় দিন বলিয়া স্থান দান করিয়া, পরে ১৩১৯ (১৯১২) সালের পঞ্জিকায় উহা থাকা সত্বেও, জাতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে, হিন্দু সন্তান কখনই ইহা উঠাইয়া দিতে পারেন না। এরূপ কাজের অপকারিতার পরিমাণ, বোধ হয়, নেতাদের অনুধাবন করিবার শক্তিই নাই। তাঁহাদের হইল "বিয়ে ফুরাইলেই ছাদনাতলায় লাথি।" ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তন্নিবন্ধন পঞ্জিকার সঙ্গে ইঁহাদের ত সম্বন্ধ নাই. ইঁহারা সবই করিতে পারেন। এটা জাতীয় সংস্কার হিসাবে ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন বর্ব্বরানুষ্ঠান ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়। যাহারা হটকারিতার অধীন না হইয়া, স্থিরভাবে বিষয় বিশেষের গুরুত্ব চিন্তা করে এবং সকল শুভাশুভ অনুষ্ঠানের অগ্র পশ্চাত ফলাফল চিন্তা করিয়া কাজে হাত দেয়, তাহারা কখনই এরূপ গর্হিত কাজের প্রশ্রয়-দাতা হইতে পারে না। যাহারা পারে, সেই শ্রেণীর লোকের ইহপরকাল জ্ঞান সমান, ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজই নাই। আত্ম প্রয়োজনে ইহারা দেশ ও দেশের স্বার্থ অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসর্জ্জন দিতে পারে। সে ত বেশী দিনের কথা নহে, কতকগুলি অল্পবয়স্ক যুবক তোমাদেরই উপদেশের ফলে বিপথগামী হইয়া বুদ্ধির দোষে জীবন দান করিয়াছে, অপর কতকগুলি রাজাদেশে নির্ব্বাসিত, আর তোমরা দেশের পরিচালক-দল নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে আনন্দ-কোলাহলে প্রমত্ত। দেশে কি এমন মানুষ নাই যে, যাহারা তোমাদের এই তামসিক রঙ্গ-রসের পশ্চাতে দারুণ মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছে? তোমরা আজ কোন্ প্রাণে জাতীয় জীবনতরণী খানি বাত্যাবিতাড়িত সমুদ্র-বক্ষে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে? টাইটানিকের নাবিক ত পলায়ন করে নাই। সে ব্যক্তি ইংরাজ কি না, তাই জাহাজ লইয়া জলমগ্ন হইল! আর তোমরা স্থাণুবৎ হইয়া এই জাতীয় জীবনের সর্ব্বনাশ সাধনের প্রশ্রয়দাতা হইলে, এই কি স্বদেশ-সেবা। জানি না, তবে মনে হয়, হয়ত আজ কাব্যবিশারদ থাকিলে এত সহজে এক কথায় "অরন্ধন ও রাখি-বন্ধন" উঠিয়া যাইত না. পঞ্জিকা-বিভ্রাটও ঘটিত না।

"পরমুখাপেক্ষী হইব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া সমগ্র দেশ ত মাতাইয়া তুলিলে, তোমাদের উপদেশে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আনন্দে আটখানা হইয়া স্বদেশী আন্দোলনকে আদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল, পরাধীন জাতির পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব

করিতে চাহিয়াছিল, সেই প্রতিজ্ঞার শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তোমরা স্বদেশীর আসব ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও বাঙ্গালীর ঘরে এখনও এমন নিষ্ঠাবান লোক অনেক আছেন, যাঁহারা স্বদেশী ভিন্ন বিদেশী ব্যবহার করেন না। সেই সকল মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে তোমরা পতিত। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-পাপে তোমরা আপনাদিগকে ও দেশকে রসাতলে ডুবাইয়াছ বলিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ৩০শে আশ্বিন অতি পবিত্র দিন। জাতীয় জীবনের "হাতে খড়ির" দিন। ঐ হাতে খড়ির গুরু মহাশয়গণ এখন পলাতক, প্রাণভয়ে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। আজ আর "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" কেহ গান করে না, আজ আর "আমার মা সোণার বাঙ্গালা" কেহ বলে না। এখন আর "বিজয়ার বাসনা" "Lucky Day"-এর কথা কেহ স্বপ্নেও দেখে না; আর চুঁ শব্দটী নাই, সব চুপ চাপ। তাই কবি বলিয়াছিলেন "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৩ পর্য্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর কাল নানা বিঘ্ন বিপত্তি ও লোক ক্ষয়ের পর পরাজিত ইংলণ্ডর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষায় ব্যস্ত হন। সে ঘটনাও আজ প্রায় ১৩০ বৎসর হইতে চলিল! এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যুক্তরাজ্যের লোকমণ্ডলী কেন স্বাধীনতার স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন? বাঙ্গালীর জাতীয় আন্দোলনের ফলেই যদি ভারতসম্রাট তদীয় মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে ভাঙ্গা বাঙ্গালা জোড়া দিয়া তদীয় ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের অশ্রুজল মোচন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ত রাজরাজেশ্বর ভারত-সম্রাটের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ও তদীয় মন্ত্রণা-দাতাদের প্রতি হৃদয়ের সদ্ভাব জ্ঞাপন জন্যও ৩০শে আশ্বিন চির-নির্দ্ধারিত পবিত্র দিন বলিয়া গণ্য করা বাঙ্গালীর পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। তাহাই বা কেন হইল না? যাঁহারা রোকা জারি করিয়া দেশের লোককে কার্য্য বিশেষে প্রবৃত্ত করিতে পটু, যাঁহারা পুষ্প-মুকুটে (Floral Crown) পরিশোভিত হইয়া দেশের ও দশের পূজা গ্রহণে ব্যস্ত, তাঁহারা কি এ সকল গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহেন? ৩০শে আশ্বিন রদ করে কে? রদ যেই করুক, ইহার জন্য দায়ী বঙ্গের সপ্তরথী,—যাঁহারা কার্য্যোদ্ধারের সময়ে রোকা জারি করিতে অগ্রসর, তাঁহারাই এই অধর্ম্মা-চরণের জন্য দায়ী। আমরা জানিতে চাই, তাঁহাদের এরূপ চুপে চুপে এই জাতীয় অনু-ষ্ঠানটী লোপ করিবার কি অধিকার ছিল? এখন দেশের লোকের নিকট এই বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা স্বদেশের ও স্বজাতির হিতের জন্য হয়, এইরূপ দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন প্রধানগণের প্রাধান্য অস্বীকার করুন, আর না হয়, এই সকল দিকপালগণের এই গুরু পাপের প্রায়-শ্চিত্তের সুব্যবস্থা করুন। তবেই বুঝিব যে, এ জাতির জাতীয় কল্যাণের সহজ পথ এখনও মুক্ত আছে, নতুবা বুঝিতে হইবে যে, দেশের দশজন যেমন কর্ত্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞানবিহীন, আপামর-সাধারণ জনমণ্ডলীও তদ্রূপ আত্মো-ন্নতি-বিমুখ। আশা করি, দেশের লোক এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলিয়া নায়ক-দলের দিব্য-জ্ঞানের উদয় করিয়া দিতে বিলম্ব করিবেন না।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেম-শিশু।

Love, strong as Death is dead,
Come, let us make his bed
Among the dying flowers
A green turf at his head,
And a stone at his feet,
Whereon we may sit
In the quiet evening hours
Miss C Rossetti

(১)
মৃত আজ প্রেম-শিশু,—দাও গো সমাধি তায়।
এই তটিনীর কূলে,
এই বকুলের মূলে,
এই শুভ্র জ্যো'স্না-তলে, তৃণ-ফুলবিছানায়।

(২)
বকুল ঢাকুক্ ফুলে, ব্যজন করুক্ বায়,
শিশির ঝরুক্ শিরে,
শশী চা'ক ফিরে' ফিরে',
তটিনী কাঁদুক্ তীরে—লুটিয়া লুটিয়া পায়।

(৩)
কিছুতে সে বুঝিল না, বুঝিনু না কি যে চায়!
আগ্রহে আদর করি',
দিলাম হৃদয় ভরি'
কত সুখ, সাধ, আশা, কত স্নেহ,মমতায়।

(৪)
এত যত্ন, এত স্বপ্ন, এত সুপ্ত বাসনায়—
তবু সে পেলে না সুখ!
দিন দিন ম্লান-মুখ,—
মুদিল নয়ন-যুগ কি লুকান' বেদনায়!

(৫)
মিছা সুখ, মিছা দুখ, মিছা ভয় ভাবনায়।
কাঁদিয়া কি হবে ফল?
মুছ নয়নের জল;
চল ধীরে ঘরে ফিরে'—দুই পথে দু'জনায়!

(৬)
তোমায় আমায় যদি দেখা হয় পুনরায়—
তুমি অন্য পথে যেও,
তুমি অন্যদিকে চেও,
পথের পথিক মোরা—কেহ নাহি জানে কা'য়!

(৭)
দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, যুগ যায়—
যেতে এই পথ দিয়া
আকুলিয়া ওঠে হিয়া,
বিষণ্ণ-সায়াহ্নে কোন নবঘন-বরিষায়,—

(৮)
আসিও সমাধি-পাশে নত-মুখে পায় পায়।
সমীর কাতরে শ্বাসে—
গত কথা মনে আসে,
আশেপাশে কায়া মোর ছায়া সম মিশে' যায়!

(৯)
মুছিতে নয়ন দুটি হয় তো দেখিবে তায়!
পা ফেলিয়া ফুলে ফুলে,
কচি দুটি বাহু তুলে'
উঠিতে তোমার কোলে আসে কেঁদে উভরায়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

নাসিক ।

কলিকাতা হইতে জব্বলপুর হইয়া নাসিক-মেলে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৪৮/০ আনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪৩৷৵০ ও নাগপুর হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৩৸৶০ আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৯৷৵০। ষ্টেসন হইতে নগর পাঁচ মাইল। আজকাল ট্রাম হইয়াছে, আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন ট্রাম ছিল না। আমরা বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন কালে নাসিকে নামি, ষ্টেশনের বিশ্রাম-গৃহে রাত্রে বাস করিয়া পরদিবস প্রাতে টোঙ্গা করিয়া নগরে যাই। ষ্টেশন-মাষ্টার আমাদিগকে শান্তিরাম পাণ্ডার আলয়ে যাইতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে আমরা গোদাবরীতীরে শান্তিরামের নিকেতনে উপস্থিত হই।

পুরাকালে দক্ষিণাপথের মধ্যে—

"স্নিগ্ধ শ্যামাঃ ক্বচিদপরতঃ ভীষণা ভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখর ককুভো ঝঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্
এতে তীর্থাশ্রম-গিরি-সরিদ্গর্ত্ত-কান্তার মিশ্রাঃ
সংদৃশ্যন্তে পরিচিত ভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ।"

এক বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। নাসিক সেই স্নিগ্ধ-শ্যাম পর্ব্বত-কান্তার-পূর্ণ দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র জানকী ও লক্ষ্মণ সহ দীর্ঘ বনবাস কাল অতিবাহিত করেন। এই স্থানে রাবণ-অনুচর খরদূষণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হয় ও লক্ষ্মণ এইখানেই সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন। সেইজন্য স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। এই স্থান হইতে দুষ্কৃত দশানন লক্ষ্মী-স্বরূপা জানকীকে হরণ করেন। এই স্থানের প্রত্যেক ধূলিকণা শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীর পবিত্রস্মৃতি বহন করিয়া কাব্য ও ইতিহাস রচনা করিয়াছে।

নাসিকের মধ্য দিয়া পুণ্যসলিলা গোদাবরী প্রবাহিতা। শান্তিরামের শান্তি-নিকেতন গোদাবরীর উপরেই অবস্থিত। আমরা তথাতে পৌঁছা মাত্র রাস্তার সম্মুখে দ্বিতলের একটী সুসজ্জিত গৃহে মহাসমাদরে আশ্রয় পাইলাম। সুদূর বাঙ্গালা দেশ হইতে আগত কয়েকটী বিদেশীকে দেখিবার জন্য বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিল। লেখা বাহুল্য, এদেশে পর্দ্দা নাই। সকচ্ছ সাটী-পরিহিতা, অবগুণ্ঠন-বিহীনা, নিতম্ব-লম্বিত-বেণী কুলকামিনীগণ নিঃসঙ্কোচে আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে ইতস্ততঃ করে নাই। তাহাদের ঔৎসুক্য-পূর্ণ উজ্জ্বল নয়ন, হাস্যমধুর প্রফুল্ল আনন, আমাদের আগমন জনিত আনন্দ বার্ত্তা অব্যক্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পরম আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। একটী ৯।১০ বৎসরের বালিকাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিবা মাত্র সে এক লম্ফে আমাদের নিকট আসিয়া দুর্ব্বোধ্য অথচ সুমিষ্ট ভাষায় আমাদের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিল, ও অল্পক্ষণ মধ্যেই আমাদের যেন বহুকাল-পরিচিত স্বজন মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল।

আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে গোদাবরীতীরে গমন করিলাম। নাসিক পশ্চিমঘাট-গিরিমালার উপত্যকায় অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া গোদাবরী কলনাদে প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশ না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পার্ব্বত্য নদীর অসংযত সৌন্দর্য্য

উপলব্ধি করা কঠিন। পার্ব্বত্য নদী গঙ্গা বা পদ্মার ন্যায় বিপুল-কায়া নহে। বালিকা ও যুবতীতে যে প্রভেদ, পার্ব্বত্য ও সমতল-ভূমির নদীতে সেই প্রভেদ। উভয়ই সুন্দর, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর। একজন চঞ্চল অস্থির, অন্য ধীর ও গম্ভীর। একজন নগ্নদেহে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিতেছে, অন্য যৌবনের পূর্ণতায় আপনি ভরপুর হইয়া আছে। একজন উদ্দাম নৃত্যে, উচ্চ কলস্বরে তটদেশ কম্পিত ও মুখরিত করিতেছে, অপর ঘোর বেগে উভয় পার্শ্বের তটদেশ ভাঙ্গিয়া লইয়া আপন মনে ছুটিয়াছে। নাসিকের গোদাবরী বালিকার ন্যায় চঞ্চল ও চপল, নাচিতে নাচিতে কলনাদে ছুটিয়া চলিয়াছে। জল অগভীর, কিন্তু বেগ প্রচণ্ড ও দুর্দ্দমনীয়। এই স্বল্পতোয়া অথচ বেগবতী স্রোতস্বিনীতে স্নানের অসুবিধা জন্য নগরের মধ্যে স্থানে স্থানে স্রোত চলিবার জন্য নাতি-পরিসর পথ উন্মুক্ত রাখিয়া বাঁধ দিয়া কুণ্ড প্রস্তুত করা হইয়াছে। গোদাবরী-তটে গিয়া দেখিলাম, বিচিত্র বসন-পরিহিতা অবগুণ্ঠন-বিহীনা কুল-ললনাগণ সদ্যস্ফুট প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় ঘাট আলো করিয়া আছে। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে, কেহ কলস মাজ্জিতেছে, কেহবা তীরে বসিয়া পূজা করিতেছে। পুরুষগণ গুণ গুণ রবে গোদাবরী-স্তোত্র পাঠ করিতেছে, উভয় তীরের মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা রব ধ্বনিত হইতেছে। প্রাতঃসমীরণ পূজার জন্য সঞ্চিত পুষ্পের সৌরভ ও ধূপ ধুনার সুগন্ধ অপহরণ করিয়া ছুটিতেছে। নাসিকের গোদাবরী তীরে আসিয়া দাঁড়াইলে কাশীর গঙ্গাতীরের কথা মনে পড়ে। এখানেও উভয় তট তেমনি জনাকীর্ণ ও উচ্চশীর্ষ দেবমন্দিরে ও হর্ম্ম্যমালায় পরিপূর্ণ। নাসিক দাক্ষিণাত্যের কাশী। গোদাবরী এখানে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলিয়া পূজিত।

আমরা পুণ্য-সলিলা গোদাবরীতে স্নান তর্পণাদি শেষ করিয়া পরপারে পঞ্চবটী দেখিতে গমন করিলাম। পঞ্চবটীতে পাঁচটী অতি প্রাচীন বটগাছ আছে। বৃক্ষগুলি অতিপ্রাচীন হইলেও ত্রেতা যুগের দাবী করিতে পারেনা। তবে তাহাদের বংশধর হইতে পারে। এখানে ভূগর্ভে একটী গুহা আছে। কথিত আছে, সেই গুহামধ্যে দিবাভাগে জানকীকে লুক্কায়িত রাখিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ মৃগয়ায় দূর বনে গমন করিতেন। একটী সুড়ঙ্গ পথে হামাগুড়ি দিয়া গুহার অভ্যন্তরে যাইতে হয়। উহার মধ্যে বায়ু ও আলোক প্রবেশের ঐ সুড়ঙ্গ ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নাই। গুহাভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সীতা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সীতাদেবী এখানে কি করিয়া বাস করিতেন, বলিতে পারিনা। আমার বিশ্বাস, তিনি এখানে একদিনও বাস করিলে আর রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ড লিখিবার প্রয়োজন হইত না। আমরা তথাতে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র ছিলাম, তাহাতেই আমাদের বায়ুর স্বল্পতায় শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

পঞ্চবটী এখন আর সেই শান্তিপ্রদ নির্জ্জন আশ্রম নয়। এক্ষণে ইহা জনাকীর্ণ উচ্চচূড়-মন্দির সৌধমালায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে রামসীতার মন্দির সর্ব্ব প্রধান। এই মন্দিরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্ত্তিগুলি এতই সুন্দর যে, দেখিবার আকাঙ্ক্ষার আর তৃপ্তি হয় না। আমরা সেখানে পূজাদি সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে বাসায় ফিরিলাম, বাসায়

যাইয়া দেখি, পাণ্ডা-গৃহিণীগণ আমাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন। অতি শুভ্র আতপ চাউলের অন্ন, অড়হর দাইল, ২।৩টী তরকারী, রুটী, পায়সান্ন, দধি ও লড্ডু আহার্য্যের উপকরণ। আমাদের দেশে অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে বাহিরে পাচক দ্বারা পরিবেশন করান হয়, কিন্তু এ দেশে সে নিয়ম নাই। আমরা বিদেশী হইলেও যেন তাহাদের পরিবারস্থ লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলাম। কুলকামিনীগণ স্বহস্তে পরিবেশন ও নিকটে বসিয়া আমাদিগকে খাওয়াইবার জন্য যথেষ্ট আকিঞ্চন প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কথা না বুঝিতে পারিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের ভাষা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহাদের প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি অত্যন্ত ঝালদুষ্ট ও সর্ব্বাংশে বাঙ্গালীর মুখরোচক না হইলেও, যত্ন ও আদরের গুণে আমাদের নিকট উপেক্ষিত হয় নাই।

আহারান্তে টোঙ্গা করিয়া ৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাণ্ডবগুহা দেখিতে যাই। এইরূপ প্রবাদ আছে, এইস্থানে পঞ্চপাণ্ডব কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। ইংরাজী পুস্তকে এই গুহাগুলি লেনা কেভ্স্ (Lena caves) বলিয়া খ্যাত। একটী পাহাড়ের গাত্রে গুহাগুলি খোদিত। গুহাসংখ্যা আঠারটী। পাহাড়ের উপর উঠিবার কোন সিঁড়ি নাই। এইজন্য উঠিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। কিন্তু উপরে উঠিয়া নিম্নের রমণীয় প্রাকৃতিক শোভা দেখিলে সকল কষ্ট দূর হইয়া যায়। সেই গিরিশীর্ষ হইতে চারিদিকে দৃষ্টির শেষসীমা পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা-পরিপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর ও সুদূর-বৃক্ষচ্ছায়া পূর্ণ নগরোপকণ্ঠ—যেন তরণী পৃষ্ঠ হইতে দৃষ্ট তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্র-বক্ষ ও দূরবর্ত্তী হরিৎ বেলা-ভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে।

গুহাগুলি পর্ব্বত গাত্রে এক পংক্তিতে খোদিত। কতকগুলি বড় ও কতক ছোট। ২। ১ টী দ্বিতল। অনেক গুহাতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। হিন্দুরা বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলি ধর্ম্মরাজের ও ২। ৪ টী ভীমকায় মূর্ত্তি ভীমের মূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করে। বাস্তবিক গুহাগুলি বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। মূর্ত্তিগুলি বুদ্ধদেব ও তাঁহার পরিষদ্‌বর্গের। আমরা গুহাগুলি পরিদর্শনান্তে পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া নগরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম ও ঠিক্ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় পৌঁছিলাম।

প্রদোষে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমরা আরতি দর্শনে চলিলাম। পথে দলে দলে কুলকামিনীগণ সুবেশে ভূষিত হইয়া দেবমন্দিরে গমন করিতেছে। তাহাদের সুচারু সংযত চিকুর বিশোভিত অনাবৃত মস্তক, শশাঙ্ক লাঞ্ছিত হাস্য মুখরিত-বদন-কোরক, নবাগত বাঙ্গালীর নিকট একটী নূতন দৃশ্য বলিয়া মনে হয়। সেই চির-পরিচিত অবগুণ্ঠন মণ্ডিত আধ আলো আধ ছায়া, সেই বিদ্যুদ্দাম-চকিত কটাক্ষ ললিত-লজ্জাবতী লতার স্থানে এখানে মেঘমুক্ত পূর্ণ-শশীকলা সদা বিকশিত প্রফুল্ল কমলবালা সর্ব্বদাই নয়ন পথে পতিত হয়। বঙ্গসীমন্তিনীগণের মধুর ভাব, কমনীয়তার ও লাজনম্রতার আমরা স্তাবক, কিন্তু তাই বলিয়া মহারাষ্ট্রবালার প্রফুল্লতা ও সজীবতার মধ্যে যে একটী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা আরতি দেখিয়া গোদাবরী তটে আসিলাম ও সন্ধ্যার নির্জ্জন ছায়ায় বসিয়া নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত দীপালোকের চঞ্চল ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। পৌষ মাস অথচ

শীত নাই, এখানে চিরবসন্ত বিরাজিত। বসন্ত-সহচর নাতিশীতোষ্ণ মলয় হিল্লোলে ও স্রোতস্বিনীর আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীত-কল্লোলে মনপ্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পুলকিত হইয়াছিল।

পরদিবস প্রাতে টোঙ্গা করিয়া নাসিক হইতে ৮ মাইল দূরে গঙ্গাবপুর নামক স্থানে গোদাবরী-প্রপাত দেখিতে গিয়াছিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে বনরাজি-নীল-তরঙ্গায়িত প্রান্তর, অদূরে ক্রমোন্নত শৈলশৃঙ্গ গগনপটে মেঘমালা বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। প্রপাতের ১ মাইল দূর হইতে জলকল্লোল শুনিতে পাওয়া যায়। যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই শব্দ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে। প্রপাতের অর্দ্ধ মাইল দূরে টোঙ্গা হইতে নামিয়া ক্রমোন্নত শৃঙ্গমালা-সঙ্কুল গোদাবরী-তটাবলম্বনে যাইতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলখণ্ডের মধ্য দিয়া গোদাবরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় বিভক্ত হইয়া ছুটিতেছে। সেই স্রোতবেগে কম্পিত উপল-খণ্ডের উপর দিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল গমন করিলে প্রপাতের সম্মুখীন হওয়া যায়। পথ নিতান্ত সুগম না হইলেও চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, পদতলে রজতধারাবৎ গোদাবরীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনির মাধুর্য্যে ও অদূরস্থিত প্রপাতের দিগন্ত-কম্পিত শব্দের গাম্ভীর্য্যে মন আনন্দে এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠে যে, পথের কঠোরতা কিঞ্চিদপি অনুভূত হয় না। নিকটে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া পড়িতে হয়। প্রকৃতির কি অদ্ভুত ক্রীড়া। কি বিরাট উচ্ছ্বাস! কি উদ্দাম উন্মত্ততা! দেখিলাম, ৩০। ৩৫ হাত উচ্চ একটী পর্ব্বত-শিখর হইতে প্রায় ২০। ২৫ হাত প্রশস্ত একটী বিশাল জলধারা ভীম গর্জ্জনে দিগন্ত কম্পিত করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে দশ বার হাত দূরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে প্রবলবেগে পতিত হইয়া উন্মাদিনীবৎ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঊর্দ্ধ হইতে বেগে পতনজনিত উৎক্ষিপ্ত ফেনপুঞ্জে রবিকর-সম্পাতে যেন সহস্র সহস্র স্বর্ণ-যূথিকা শূন্যে প্রস্ফুটিত হইয়া নিম্নে ঝরিয়া পড়িতেছে। কিম্বা শত শত তুবরী বাজী যেন যুগপৎ উত্থিত হইয়া অবিরাম ধারায় স্বর্ণ-প্রসূন বৃষ্টি করিতেছে। দিবা নাই, রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেই বেগ, সেই গর্জ্জন, ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ, প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব ক্রীড়া সমভাবে চলিতেছে। অতি কষ্টে ও সন্তর্পণে পর্ব্বতের পাদদেশে গমন করিয়া বৃত্তাকারে পতিত জল-প্রপাতের যথাসম্ভব নিকটবর্ত্তী হইলে সেই তরল বৃত্তাভাসচুম্বী রবিকরজালের বামধনুস্পন্দী বর্ণ-বৈচিত্র্য ও তদন্তরালে স্তোকমলিন সূর্য্যরশ্মির মৃদুমন্দ বিকাশ—এই রৌদ্র-মধুর ভাবের অপরূপ সমাবেশ, এই আলোক ও ছায়ার মধুর সম্মিলন—যে অনুপম সুষমা লোকলোচনের সম্মুখে প্রকটিত করে, তাহার বর্ণনা কবিতা বা কল্পনার অতীত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অপূর্ব্ব অননুভূত সৌন্দর্য্য অধিকক্ষণ উপভোগ করিতে পারি নাই। ঊর্দ্ধ-বিচ্যুত তুহিনশীতল বিন্দু বিন্দু জলকণা-সংস্পর্শে বারিপ্রপাত-জনিত পাদপৃষ্ঠ পর্ব্বতশৃঙ্গের অবিরাম কম্পনে এ দুর্ব্বলহৃদয়ে প্রকৃতই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করিয়াছিল।

জল-প্রপাতের নিম্নে শৈলমালার কি সুন্দর দৃশ্য। চারিদিকে অসংখ্য পর্ব্বত-শ্রেণী, স্তরে স্তরে উপলখণ্ডের নিম্নে উপল খণ্ড, শৃঙ্গের নিম্নে শৃঙ্গ, ক্রমাবনত হইয়া চলিয়াছে। সেই শৃঙ্গরাজির উপর দিয়া গোদাবরী শুভ্র কুসুমরাজিৎ ফেন-পুঞ্জ বিকীর্ণ করিতে করিতে

ভীমবেগে গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়াছে। পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগুলি সঙ্গিনীর ন্যায় কুলুকুলু নাদে মঙ্গল-ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছে।

এই প্রপাতের নিকট নয়টী দেবমন্দির আছে। এমন অপরূপ দেববাঞ্ছনীয় স্থানে দেবমন্দির থাকিবারই কথা। আমাদের পাণ্ডা দেবমন্দিরে গিয়া দেবদর্শন ও পূজার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু প্রকৃতির ঐ বিরাট মূর্ত্তিতে জাগ্রত দেবতার অনুভূতি পাইয়া আর আমাদের সেই ভাস্কর-নির্ম্মিত দেব-মূর্ত্তি দেখিতে আগ্রহ জন্মে নাই।

নাসিকের এক মাইল দূরে তপোবন। কথিত আছে, এই স্থানে লক্ষ্মণ তপস্যা করেন। তপোবনে যাইতে পথে হনুমানজীর মন্দির দর্শন করিলাম। স্বয়ং ভগবান হইতেও ভক্তের সম্মান অধিক।

বিহগ-গীত-মুখরিত লতাবিতান-মণ্ডিত বিটপীচ্ছায়া-শ্যামায়িত তপোবন প্রকৃতই যেন বাল্মীকি ও ভবভূতি-বর্ণিত শান্তিপ্রদ আশ্রম বলিয়া মনে হইল। কাব্য পুরাণাদি পাঠে তপোবনের যে একটী মধুর ও শান্ত পবিত্র স্মৃতি আমাদের হৃদয়-দর্পণে এতদিন প্রতি-বিম্বিত ছিল, তাহার যথার্থ প্রকৃতি এইখানে প্রথম দেখিলাম। তপবোনের পার্শ্ব দিয়া গোদাবরী প্রবাহিত; তাহার অদূরে মেঘালঙ্কৃত নীলশিখর শৈলমালা। নিকটে গিয়া দেখি—সেই পর্ব্বত-বন্ধুর পাষাণ বক্ষে প্রতিহত-গতি গোদাবরী ফেন-পুঞ্জ উদ্গীরণ করিতে করিতে গদ্গদ নাদে ছুটিয়া চলিয়াছে। কোথায়ও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসের সৃজন করিয়া শুভ্র কুসুম-রাশি ছড়াইতে ছড়াইতে আনন্দের কল্লোল তুলিয়া ছুটিতেছে। কলনাদিনী গোদাবরীর গভীর আরাব শ্রবণে, মেঘ-গর্জ্জন-ভ্রমে শিখী শিখিনীগণ কলাপবিস্তারে নৃত্য করিতেছে, মৃগকুল আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া শিখী-সনে নৃত্যে যোগদান করিয়াছে। সরিৎতটশোভী কুসুমিত লতাকুঞ্জ হইতে পিক-কুল আনন্দে ঝঙ্কার দিতেছে। সন্তাপ-হারিণী, শক্তিপ্রদায়িনী এমন বনস্থলী অন্যত্র দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরামচন্দ্র দীর্ঘ বনবাস কাল অতিবাহিত করিবার জন্য এই স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজার নন্দিনী রাঘব-ঘরণী প্রকৃতির এই রম্য-কাননে এক দিনের জন্যেও নির্ব্বাসন-ক্লেশ অনুভব করিতে পারেন নাই, তাই তিনি বলিয়াছেন—

"ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে
কপোত কপতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে
নাম পঞ্চবটী; মর্ত্ত্যে সুরবন সম।"
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ রাজার নন্দিনী
রঘুকুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে
পাইনু সরমা সেই পরম পীরিতি।"

এখনও পাঁচটী পুরাতন বটবৃক্ষ আছে। এজন্য এ স্থানও পঞ্চবটী নামে খ্যাত। ধর্ম্ম-প্রাণ মহাত্মাগণের ভক্তির কল্যাণে এখানেও দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়া শান্তি-পূর্ণ নির্জ্জনতার কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাঘাত করিলেও, এখন পর্য্যন্ত জনকোলাহলের আবিলতা আসিয়া তপোবনের শান্তি-পূর্ণ পবিত্রতা সম্যক্ নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনও

"কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার কান্তি আমি⋯"

কথিত আছে, এইখানে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন। দুইটী ছিদ্র বিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ড সূর্পণখার ছিন্ন নাসিকার অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

নাসিক অতি সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে দুই হাজার ফিট উচ্চ।

বায়ু শুষ্ক ও নাতিশীতল। সর্ব্ব সময়ে চির-বসন্ত বিরাজিত। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া ইহাকে ভারতের রাজধানী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাধ্যমত চেষ্টা পান। নাসিক পার্ব্বত্য প্রদেশ হইলেও অতিশয় উর্ব্বর। এখানে কপি, আলু, বেগুণ প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট তরকারি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার বেগুণ এক একটী অলাবু বিশেষ। এখানে সুমিষ্ট আঙ্গুর ফল প্রচুর জন্মে। নাসিকের তাম্র ও পিত্তল-নির্ম্মিত তৈজস পত্র দক্ষিণ ভারতে প্রসিদ্ধ। আমরা আসিবার কালে পিত্তল-নির্ম্মিত সুন্দর ঘটী, চার পেয়ালা প্রভৃতি নাসিকের স্মৃতি রক্ষার জন্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম।

শ্রীকুঞ্জলাল সাহা।

স্বদেশি-তত্ত্ব।

প্রতিবাদ।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত চাবুকরাম চৌবে মহাশয় লিখিত "স্বদেশি-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধটী পড়িয়া আমার মনে কয়েকটী প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম, যদি আপনার কাগজে প্রকাশিত হইবার যোগ্য হয়, তবে আশা করি, তাহা করিবেন।

শ্রীযুক্ত চাবুকরাম চৌবে মহাশয় লিখিত "স্বদেশি তত্ত্ব" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যেমন কোন কোন স্থানে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিয়াছি, তেমনি কোন কোন স্থানে হইতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত চৌবে মহাশয়ের উদ্দেশ্য যে সাধু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং তিনি যে দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, তাহাও ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিলাম। শ্রীযুক্ত চাবুকরাম বাবুর নামও এ সঙ্গে সার্থক হইয়াছে, কারণ তিনি যেন চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়া দেশের চৈতন্য সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নিদ্রা যেখানে যত গভীর, নিদ্রা ভাঙ্গাইবার যন্ত্রটীও সঙ্গে সঙ্গে তেমনি শক্ত না হইলে কি নিদ্রা ভাঙ্গে? মাঝে মাঝে নির্ম্মম ভাবে তীব্র সমালোচনার দ্বারা দেশের প্রকৃত অবস্থার চিত্র জন-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করার আবশ্যকতা বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিবে না, কিন্তু সেই সমালোচনা করিতে গিয়া কাহাকেও যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইতে না হয় এবং সমালোচনা যেন সমালোচনার জন্যই না হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। লেখক এ প্রবন্ধটী দ্বারা বাঙ্গালী চরিত্রকে যত দূর জঘন্য ভাবে চিত্রিত করা সম্ভব, তাহা করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতি ছত্র হইতে যেন দেশের নেতৃবর্গের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এইরূপ সমালোচনার দ্বারা দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই; বরং যে জাতির সম্মুখে এরূপ অকর্ম্মণ্যতার চিত্র উপস্থিত করা হয়, তাহার মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে আত্ম-বিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটী গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। সুবক্তা শ্রীযুক্ত ইসমাইল সিরাজী মহাশয় গল্পটী বলিয়াছিলেন। একটী বাঘের বাচ্ছা ঘটনা ক্রমে একটী মেষ-পালের

মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং তাহাদের সহিতই বর্দ্ধিত হইতে থাকায় তাহার স্ববৃত্তি ভুলিয়া গিয়া মেষ-বৃত্তি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইতি-মধ্যে একদিন একটী বাঘ ঐ মেষপালের মধ্যে একটী মেষকে লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে ঐ বাঘের বাচ্ছার উপরই পড়ে, ফলে স্বজাতি বলিয়া চিনিতে পারায় আশ্চর্য্য হইয়া, তাহার মেষ-পালের মধ্যে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া, নানা রকমে সে যে বাঘের বাচ্ছা, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে নিকটবর্ত্তী একটী কূপের নিকট যায়। তাহাদের প্রতিবিম্ব হইতে সাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়া তবে সেই বাঘের বাচ্ছাকে বুঝায় যে, সে বাঘের বাচ্ছাই—মেষের বাচ্ছা নহে। আমাদের অবস্থাও, আমার বোধ হয়, ঠিক তাই, আমরা সিংহ-শিশু মেষে-পরিণত হইয়াছি, কাজেই আমার মনে হয়, আমরা যে সিংহ-শিশু, মেষশাবক নহি, তাহা বুঝাইতে হইলে "তোমরা সিংহ-শিশু মেষশাবকে পরিণত হইয়াছ" এবং "যদি বিশ্বাস না কর, তবে তোমাদের মধ্যে কখনই অমুক অমুক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না"—এই ভাবে বলিলেই যেন ভাল হয়।

শত শত বৎসর ধরিয়া "বাঙ্গালি, তুই কিছু না, বাঙ্গালি, তুই কিছু না" এইরূপ বলিতে বলিতে আমরা কিছু না-ই হইয়া দাঁড়াইয়াছি। বাস্তবিক আমরাও যে মানুষ, আমরাও জগতে কিছু না কিছু করিতে পারি, একথা বিশ্বাস করিতে প্রাণ চায় না। অবশ্য যদিও লেখক বাঙ্গালী, তুই কিছু না, এই কথাই স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই, তথাপি তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পড়িলে যেন মনে স্বতঃই সেই ভাবের উদয় হয় এবং আমি সেই ভাব অবলম্বনে লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের এখন যাহাতে আত্মশক্তি জাগরিত হয়, সেই কথাই বলা উচিত এবং কেবল মাত্র নিরাশার কথার দ্বারা অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা না করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে কিছু আশার কথা শুনানও উচিত। তাই বলিয়া যে দেশের প্রকৃত অবস্থার চিত্র লোকের সম্মুখে ধরিতে হইবে না, তাহা নহে। দেশের লোককে যে ভাবেই হউক, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা করার সহিত এ কথাটুকু বলা নিতান্ত প্রয়োজন যে, তাহারা যতই মনুষ্যত্ব-হীন অকর্ম্মণ্য হউক না কেন, তাহারাও চেষ্টা করিলে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে—তাহাদের মধ্যেও সে শক্তি আছে।

তারপর লেখক বর্ত্তমান অনুকরণপ্রিয় নেতৃবর্গের সহিত কবিবর হেমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ নকল স্বদেশীর দলে ফেলিয়া বেশ একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন, সকলই যেন ইংরেজ অনুকরণে স্বাধীনতা-প্রয়াসী, ইংরেজের নিকট হইতে ধার করা ভাব লইয়া স্বদেশের জন্য স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, কেহই যেন সে ভাব হজম করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ সে ভাবকে কেহই যেন আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। লেখকের উক্তি হইতে এই কথাই বুঝিতে পারিয়াছি এবং সত্যই যদি তাই হয়, তবে দেখিতেছি, যাহারা এই স্বদেশীর মন্ত্র-গুরু এবং একমাত্র পুরোহিত, তাঁহারা সকলেই ভণ্ড, তাঁহাদের মধ্যে একজনও খাঁটী লোক নাই। লেখকের এইকথা বলিবার বাস্তবিক কোন সঙ্গত দাবী আছে বলিয়া মনে হয় না। আর যদি হেমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই ধারকরা ভাব লইয়া স্বদেশী কারবার চালাইয়া থাকেন, তবে

একথা বলিলে বোধ হয়, কোন অন্যায় হইবে না যে,বাঙ্গালা দেশের মধ্যে কেবলমাত্র লেখক মহাশয়ই খাঁটী স্বদেশী ভাব লইয়া স্বদেশি-তত্ত্ব প্রচার করিতে আসরে উপস্থিত হইয়াছেন। লেখক মহাশয় কি জানেন না যে, জগতে ভণ্ডেরা যে ভাব প্রচার করে, তাহার স্থায়ীত্ব কোন দিনই নাই বলিলেই হয় এবং অধিকাংশ স্থলেই নিষ্ফল হইয়া থাকে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন কি সেইরূপই নিষ্ফল হইয়াছে? কলকারখানা তৈয়ারী না হইতে পারে, যৌথ-কারবারে আশানুরূপ উন্নতি না হইয়া থাকিতে পারে, কারণ এই সমস্ত বিষয়ের উন্নতি করিতে হইলে যে সমস্ত অনুকূল অবস্থার আবশ্যক, তাহাত নাইই, বরং রীতিমত প্রতিকূল অবস্থা বর্ত্তমান, সেইজন্য বলিতেছি যে,এই সামান্য সময়ের মধ্যে এই প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বদেশী কারবারে আশানুরূপ উন্নতি করিতে না পারিলে তাহাতে নিরাশ হইবার কিছুই দেখিতে পাই না। একটী জাতির উত্থানের পক্ষে ৫।৬ বৎসরের চেষ্টাই কি খুব বেশী, এই কথাই কি লেখক মহাশয় বলিতে চাহেন? তারপর লর্ড হার্ডিঞ্জ (Hardinge) হইতে আরম্ভ করিয়া সার আশুতোষ প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে শিক্ষাদ্বারা মানুষের আবাদ করিতেছেন, তাহাই যদি শ্রেষ্ঠ হয় এবং তাহাতেই যদি লেখক মহাশয়ের আশানুরূপ মানুষ প্রস্তুত হয়, তবে লেখকের উল্লিখিত নিরাশ্রয় বিধবার এবং দরিদ্রের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা পুষ্ট কলকারখানা এবং যৌথ কারবারগুলিও নষ্ট হইয়া যাওয়া উচিত ছিল না, কারণ, এ সমস্ত কার্য্যগুলি লেখকের বড় সাধের বিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত মহাত্মাগণ দ্বারাইত পরিচালিত হইতেছিল!!

তারপর কবিবর হেমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই যদি কল্পনার মোহ-মদিরায় আচ্ছন্ন হইয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, তবে লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার করিতে গিয়া, এই দেশের জন্য যখন এক একটী Garibaldi এবং Washington চাহিতেছেন, তখন তিনিও যে উপরোক্ত মহাপাপ হইতে একেবারে মুক্ত,একথা কেমন করিয়া বলিতে পারি? লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধের অন্যান্য অংশের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার প্রবন্ধ হইতে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, স্বদেশী, বয়কট, যৌথ-কারবার ইত্যাদি করিয়া আমাদের কোন ফল নাই এবং পাইবও না। পরিশেষে তিনি বৃথা আন্দোলন ও হুজুগ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গৃহে যুবকদিগের সুশিক্ষার বিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গৃহে গৃহে যুবকদিগের সুশিক্ষার বিধান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য,সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিনীতভাবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—তিনি হুজুগ ও বৃথা আন্দোলন কাহাকে বলেন? তিনি কি বলিতে চাহেন যে, স্বদেশী আন্দোলন একেবারে বৃথা হইয়াছে? স্বদেশী আন্দোলনে কি একটীও মানুষের মত মানুষ প্রস্তুত করে নাই? লেখক মহাশয়, যিনি আজ উচ্চ চীৎকার করিয়া বাঙ্গালী জাতির ঘৃণিত চরিত্রের চিত্র জনসমাজে উপস্থিত করিয়া দেশের হিতার্থী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তিনি কোন্ আন্দোলনের ফলে স্বদেশি-তত্ত্ব লিখিতে বসিয়াছেন? অবশ্য একথাও সত্য যে, একদিকে যেমন স্বদেশী আন্দোলনে আমরা অনেক স্থলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, অনেক স্থলে আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া নিরীহ দেশবাসীকে প্রতারিত করিয়াছি এবং অনেক সময় মিথ্যাকে সত্য

বলিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে গিয়া সমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছি, তেমনি, এক-থাও ঠিক যে, এই আন্দোলনে ইতর ভদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সকলেই জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিয়াছেন এবং অন্য সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও, এই আন্দোলন এমন দুই চারিজন মহাপুরুষের জন্মদান করিয়াছে যে, যাঁহাদিগকে পাইলে যে কোন জাতি যে কোন সময়ে গৌরব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। এক কথায়, স্বদেশী-আন্দোলনে আমাদের প্রকৃত অবস্থা যেমন বুঝিতে পারিয়াছি, তেমন আর কিছুতেই পারি নাই। যে আন্দোলন কোন জাতির মধ্যে Consciousness আনিয়া দেয়, সে আন্দোলনকে কি লেখক মহাশয় বৃথা হুজুগ বলিতে পারেন? শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্ন্যাল।

দুর্গোৎসব।

(১)

অবোধ সন্তান আমি ছিনু পথ চেয়ে,
কবে বরষের পরে,
বরদে! আসিবে ঘরে,
কবে জুড়াইব হিয়া মা! তোমারে পেয়ে?
চিন্ময়ী মৃণ্ময়ী বেশে,
যখন দাঁড়াও এসে,
আনন্দ-তরঙ্গ ছোটে শত শিরা বেয়ে,
মানব জনম ভুলি থাকি শুধু চেয়ে!

(২)

দেখ মা এনেছি আজি কুসুমের ভার,
শেফালিকা শতদল,
রক্তজবা ঢল ঢল,
চম্পক অপরাজিতা করবী কহ্লার,
আনিয়াছি ডাব চিনি,
ভোগের বাতাসা কিনি,
আনিয়াছি চা'ল ছোলা শক্তি যা' আমার,
পূজিব মা বিশ্বেশ্বরী,
বিশ্বময় ভিক্ষা করি,
দিব আজি শ্রীচরণে ষোড়শোপচার,
অধম সন্তান আমি বিশ্ব-দেবতার!

(৩)

কেন মা আমারে ওরা বলে "শতধিক্"—
দিয়ে মাটী, খড়, দড়ী,
তোমার প্রতিমা গড়ি,
তাই হাসে জ্ঞানিগণে বলি "পৌত্তলিক?"
তুমি যে মা নহ মাটী—
অনন্ত দেবতা খাঁটি,
আমি-ই সে সব কিছু বুঝি না অধিক;
আমি জানি করি পূজা,
মহাশক্তি—দশভূজা,
যে পূজায় নব জন্ম "ধন্য" বাস্তবিক।
প্রতিপদ-কল্পারম্ভে
আহ্বানি মা জগদম্বে,
স্থাপিয়া মঙ্গল-ঘট সর্ব্বমাঙ্গলিক,
ব্রতী বিপ্র পড়ে চণ্ডী,
শুনি যায় পাপ খণ্ডি,
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" অমৃত অধিক!—
তেজোময়ী ব্রহ্মময়ী সে কি কাল্পনিক?

(৪)

যে বলে বলুক মোরে "মূর্খ পৌত্তলিক"
আমি তোরে করি পূজা,
বিশ্বরূপা দশভূজা,
অনন্তের ক্ষুদ্র চিত্র পূর্ণ দশদিক্;
দলিতে পাশবাসক্তি,
সিংহ পৃষ্ঠে মহাশক্তি,
দশ ভুজা দশধর্ম্ম অস্ত্র-উপাধিক*,
ভীষণ আসুর-প্রাপে
নাশিছ আপন দাপে,
মহিষমর্দ্দিনী রূপে উজলিয়া দিক;
ধনদা জ্ঞানদা বেশে,
লক্ষ্মী সরস্বতী এসে,
দাঁড়াইয়া দুই পাশে হেরি অনিমিখ;

* ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।

কিবা পুণ্য দরশন,
সিদ্ধিদাতা গজানন,
কুমার ময়ূরোপরি তেজস্বী নির্ভীক;
উৰ্দ্ধেতে শঙ্কর শিব,
স্মরণে বিমুক্ত জীব,
মাটীর পুতুল কই এ যে আধ্যাত্মিক!
না পেয়ে তোমার সীমা,
গড়িয়াছি এ প্রতিমা,
সাজাই ডাকের সাজে সাধ আন্তরিক।
জননীর ফটোগ্রাফ,
নাশে তো শিশুর তাপ,
আমি তব মূর্ত্তি গড়ি দোষ কি অধিক?
সন্তানের পূজা লহ,
এ চণ্ডীমণ্ডপে রহ,
বসি মা তোমারি ধ্যানে ভুলি দিগ্বিদিক্,
যে হাসে হাসুক মোরে বলি "পৌত্তলিক"।

৫

তিন দিন পূজা করি, পরে বিজয়ায়,
শুভ সাধনার ধন,
জলে দিব বিসর্জ্জন,
শিখিব সে মহাত্যাগ মহা তপস্যায়,
যখন ফিরিব ঘরে,
প্রাণ দিব পরাপরে,
ধনী দীন শত্রু মিত্র ভুলি ভিন্নতায়,
বঞ্চিত হবে না কেহ,
নিতে ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ,
পর নাই, শত্রু নাই, বিজয়া নিশায়,
তোমারে পূজিয়া তারা,
সকল হীনতা-হারা,
দেবীর সন্তান আমি "পর" কে কোথায়?
ভাই ভাই বোনে বোনে,
প্রাণ ভরা আলিঙ্গনে,
তুষিব মায়ের মন মিলন-বন্যায়!
শুভ দুর্গোৎসব হেন,
যুগে যুগে করি যেন,
অবোধ সন্তান তোর এই বর চায়,
মৃণ্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগ বাঙ্গালায়।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

ভূতে ভূতে।

গত কার্ত্তিক মাসের "নব্যভারত" পত্রে আত্মা-মিডিয়ম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রাহ্মসমাজ, ভারত ও জগতের উন্নতি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা সন্দেহে পতিত হইয়াছি।

প্রথম সন্দেহ, আত্মা ও মিডিয়মেরা এ পর্য্যন্ত যে স্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যজনক, সত্য, কথাই বলিয়া বুঝা গিয়াছে। অলৌকিক-রহস্য নামক মাসিক পত্রাদিতে তাহা দ্রষ্টব্য। কিন্তু এই আত্মার তদ্রূপ কিছু পাওয়া গেল না। যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের প্রবন্ধের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইল, কাজেই উক্ত প্রবন্ধটীর প্রতিবাদ করিতে আমরা বাধ্য হইলাম। আমাদের দ্বিতীয় সন্দেহ এই যে,— ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ভারত ও জগতের কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রবন্ধের মধ্যে দেখিতে গিয়া দেখিলাম যে, ১ম উদ্দেশ্য "একতা ভিন্ন ভারতের উন্নতি অসম্ভব, ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে কে এক জাতি করিবে?" উত্তরে—"ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহা করিতে পারে।" কিন্তু তাহা পারে নাই, কবে পারিবে? ইহার উত্তরে লেখক মহাশয় বলিতেছেন, "ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইলেই দেশে যথার্থ ভ্রাতৃভাব আসিতে পারে," অতএব এখনও তাহা আসে নাই।

২য় উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে "ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রী জাতিকে চির বৈধব্যরূপ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন।" কিন্তু ইহা পাশ্চাত্য সমাজ সহিত কি না, তাহা প্রবন্ধে প্রকাশ নাই।

তৎপরে লেখক মহাশয়ের তৃতীয, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ উদ্দেশ্যে যথাক্রমে প্রথম উদ্দেশ্যের কথাই পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে, যেমন "তৃতীয় উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করা," চতুর্থ উদ্দেশ্য "সকল শ্রেণীকে একসূত্রে গ্রথিত করা," পঞ্চম উদ্দেশ্য "জাতিভেদ গিয়া আমরা সকলে এক জাতি হইব।" ষষ্ঠ উদ্দেশ্য "সাম্প্রদায়িক ভাব ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করা।" কিন্তু সপ্তম উদ্দেশ্যে কিছু নূতন কথা পাইয়াছি তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, "ধর্ম্ম ও নীতিকে এক করা।" এই উদ্দেশ্যে লেখক মহাশয় পূর্ব্বের উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করা", কিন্তু তিনিই সপ্তম উদ্দেশ্যে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ অর্থাৎ বিদ্বেষ দূর না করিয়া বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন।

যদি বলেন, উহা ভূতুড়ে প্রবন্ধ "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ। তাহা হইলে আর আমাদের কোন কথা নাই।' কিন্তু আমাদের তৃতীয় সন্দেহ এই যে, হিন্দুরা এখন স্ত্রী শিক্ষা দিতেছে, স্থল বিশেষে বিধবার বিবাহ চালাইতেছে, ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে শূদ্রের সঙ্গে একাসনে বসিতেন না, এক্ষণে তাহা বসিতেছেন, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি পুস্তকগুলি ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকে পাঠ করিতে দিতেন না, এক্ষণে তাহা কেহ মানিতেছে না, ওঁ কার উচ্চারণ করিতে দিতেন না এক্ষণে কেহ উক্ত কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না, এই সকল উদারতা কি ব্রাহ্মসমাজের জন্য হিন্দুরা পাইয়াছে?

আমাদের মনে হয়, তাহা পায় নাই। ইংরাজ রাজার বিধিবদ্ধ আইন এবং উদরযন্ত্রণায় হিন্দুরা প্রাচীন সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। কেন না, ইংরাজ রাজা শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপক, শিক্ষক, যাহা নির্ব্বাচন করেন, তাহাতে কাজের উপযুক্ততা থাকিলেই হইল, নমঃশূদ্র, সাঁওতাল, মগ, মান্দ্রাজী অথবা শূদ্র ও ব্রাহ্মণ, যে জাতির লোকই হউন, তাহাকে যদি সেই কার্য্যের পারদর্শী বলিয়া ইংরাজ-রাজ বোধ করেন, তবে তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার ফলেই আজ ব্রাহ্মণের ছেলে শূদ্রের নিকট পড়িতেছে। তৎপরে সমুদয় বর্ণের ছেলেরা এক বিদ্যালয়ে এক স্থানে একত্রে বসিতে পাইতেছে। উহারা বড় হইয়া আপিসের চাকুরি ইত্যাদিও কর্ম্মক্ষেত্রে সমুদয় জাতি একত্র করিতেছেন। ভারতে রেল সৃষ্টির সময় চারিশ্রেণীর গাড়ী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ রক্ষা করিবা করা হউক, এই মর্ম্মে ব্রাহ্মণেরা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-রেল-কোম্পানী তাহা গ্রাহ্য না করিয়া মূল্যানুসারে শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য যিনি যে শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিবেন, তিনিই সেই শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কে জানে হিন্দু, কে জানে সাঁওতাল, কে জানে মুসলমান, সব একাকার। এই সকল অভ্যাসের কল্যাণেই হিন্দু সমাজ বলিয়া নহে, জগতের সকল সমাজই সোজা হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের কি কৃতিত্ব আছে, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছুক।

যখন যে জাতি রাজধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজধর্ম্মের যে সকল গুণ ঈশ্বরে প্রদত্ত আছে, তাহা তখন সে জাতিরা প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টানের মধ্যে যত জাতি থাকুক, খ্রীষ্টান এখন জগতের রাজা বা সম্রাট। উহাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণ ধর্ম্ম যাহা, তাঁহারা পাই-

য়াছেন, তাহাতে কোথায় লাগে ব্রাহ্মসমাজ? উঁহারা চীনে গিয়া চীনের কন্যা বিবাহ করিয়া বসিয়াছেন। ভারতেশ্বরী মহারাণীর পুত্র কন্যা গুলির ইংরাজ জাতিতে বিবাহ সীমাবদ্ধ কি? রেঙ্গুনে দেখি, মগের কন্যার সহিত ইংরাজের পরিণয় হইয়াছে। এ দিকের কথা, সাঁওতাল পরগণায় দুমকায় দেখিলাম, সাঁওতালের মেয়ে ইংরাজ বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভের সন্তানাদি লইয়া পরম সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এসব নীতি প্রজাধর্ম্মে হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি প্রজাধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ যতই একাকারী হউন না কেন, কিছু-তেই অসভ্য সাঁওতালী কন্যাকে কেহই বিবাহ করিবেন না,--তাহা কখনই হইবে না। নিজের চাকরকে স্কুলে দিয়া কেহই তাহাকে ভাই বলিবে না। এ জগতে উন্নতির পথ দেখাইবে না। উহা পাবে কেবল রাজনীতিতে। রাজনীতির কল্যাণেই সমাজ ওতপ্রোত হয়, এবং আচার ব্যবহারের পার্থক্য বশতঃই দলবদ্ধ হয়, পরিণামে সেই দল জাতীয় নাম পায়। বৈষ্ণবেরা এখন "বৈষ্ণব জাতি" হইতে চাহিতেছে। ইংরাজ রাজা হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের আদর্শেই ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। জগতের মধ্যে যত জাতি, যত সম্প্রদায় থাকুক না কেন, মূলের ইষ্ট লইয়া সকলেই এক, তথায় কোন গোলযোগ নাই। গোলযোগ যত কিছু আচার ব্যবহারে এবং তজ্জন্যই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।

তার বলিতে ইচ্ছা করে, ইংরাজ রাজা হইয়া যে রাজনীতি ভগবানের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই যাঁহারা এজগতে সম্রাট হইয়াছেন, তখন তাঁহারাই ঐ ভগবান-দত্ত রাজনীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হিন্দু সম্রাট রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ভীম অর্জ্জুন এখনকার ইংরাজের ন্যায় ঐরূপ অসভ্য জাতির কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইংরাজ জাতি প্রায় সমুদয় মাংস ভক্ষণ করেন, ক্ষত্রিয় নীতিতেও দেখা যায়, তাহারা ঐরূপ প্রায় সমুদয় মাংসই ভোজন করিয়া গিয়াছেন।

তাই বলি, ব্রাহ্মসমাজের মাননীয় নেতা নগেন্দ্রবাবুর ভূত (মিডিয়ম) এত রুচি ভূত কেন? হিন্দুর ভূত যেরূপ ভাবে অন্যকে পাইয়া বসে, ব্রাহ্মভূত সেরূপ নয় কেন! তাঁহার ভূত আমাকে ধরুক, আমি আমার ভূতকেও ছাড়িয়া দিব,—লাগুক দ্বন্দ্ব "ভূতে ভূতে।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

হেমন্তে।

শারদ পূর্ণেন্দু লুপ্ত বিন্দু বিন্দু হয়ে ক্ষীণ,
শেষ ম্লান হাসিটিকু হ'ল কালগর্ভে লীন।
ঘোর অমা কালীমূর্ত্তি জ্বলিছে নক্ষত্র অক্ষি,
চরণে বিক্ষিপ্ত শব, উড়ে গেছে প্রাণপক্ষী।
জীবন—আতসবাজী শেষে খেলে জ্বলে শেষ,
মরণ—নিশ্চিন্ত স্থির নাহি চেতনার লেশ।
কি করাল মুক্তকেশী মুক্ত অসি, সর্ব্বনাশী—
মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু শুধু ফেলেছে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি।
পদতলে লোটে শিব বিস্মিতা উলঙ্গ শক্তি,
অমঙ্গল হ'তে একি, মঙ্গলের অভিব্যক্তি?

২

সম্বৃত সংহার মূর্ত্তি,—অলক্ষ্মী হয়েছে দূর;
অমৃতের বার্ত্তা লয়ে এস লক্ষ্মী মর্ত্ত্যপুর।

শুভ্র দীপ শিখা জ্বলে তব পথ আলো করি,—
যার স্নিগ্ধ পূতভাপে মনস্তাপ লয় হরি।
আজি দেবী আবির্ভূতা বঙ্গগেহে ফুল্লাননে,
ত্বের পাদপদ্মচিহ্ন ব্যক্ত শুভ্র আলিম্পনে।
শুক্ল প্রতিপদে পিছে ল'য়ে এসেছেন দেবী,—
ধন্য আজি পুরাঙ্গনা তোমার চরণ সেবি'।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ আশা ভরিয়া দিতেছ বুক,
তোমার আননে সুপ্ত কি পবিত্র পূর্ণ সুখ।

৩

একি পুণ্যোজ্জ্বল হাসি হাসে শশী দ্বিতীয়ায়,
কমলা দেছে'ন তাঁরে ভ্রাতৃস্নেহে অর্ঘ্যভার।
একি মহোৎসব আজ মুখরিত প্রতি গেহে,
ভগ্নী, ভ্রাতৃ স্বস্তি রত বিগলিত ভক্তি স্নেহে।
যমের ললাটে ফোঁটা যমুনা দেছিল কবে,
আজো সেই শুভাচার চলিয়াছে মহোৎসবে।
কে তুমি কল্যাণময়ি, সন্ধ্যায় তুলসী তলে
দিলে এ ঘৃতের বাতি?—আকাশে প্রদীপ জ্বলে।
কুমার পূজায় রত কে তুমি মা ক্ষৌমবাসে
শৌর্য্যে বীর্য্যে স্কন্দ সম পুত্র রত্ন অভিলাষে।

৪

আবার এদিকে গোঠে কারা এরা দুটি ভাই,
শত ধেনু সুবেষ্টিত শোভার অবধি নাই।
পোহায় সে গোপাষ্টমী গোমু তায় কি যতন।
কোথা কৃষ্ণ বলদেব—কোথা হৃষ্ট বৃন্দাবন।
একি—জগদ্ধাত্রীরূপে জননী আমার তুমি,
আবার বিরাজ' আসি পবিত্রিয়া বঙ্গভূমি।
দিয়েছে কেশরীরাজ পাতি নিজ পৃষ্ঠাসন,
মদমত্ত করী তার পদতলে নিচেতন।
বিষধর অজগর তব অঙ্গ-আভরণ,
নবমীর জয়বাদ্যে বিকম্পিত ত্রিভুবন।

৫

মার্গশীর্ষ সমাগত—কি আনন্দ ঘরে ঘরে,
নবান্ন দিতেছ মাতঃ জনে জনে স্নেহাদরে।
প্রাণমন পুলকিত কি অপূর্ব্ব সে সৌরভ,
সে প্রসাদ লভিবারে কত প্রীতি কলরব।
অগ্রে দেবতার পূজা অতিথির সেবা আর,
তাহাতেই পরিতৃপ্তি—কি উদার সদাচার!
হেমন্তে ভাণ্ডার পূর্ণ করি স্বর্ণ ধান্য ধনে—
রয়েছ নিযুক্ত সবে—সদাব্রত—বিতরণে।
সম্পদ সুষমাময়ি, হে কমলা মা তোমার—
প্রকাশে বিভাসে বিশ্ব অপ্রকাশে অন্ধকার।

৬

এ কি দেব লক্ষ্মীকান্ত—কি প্রশস্ত স্মিতজ্যোতিঃ,
পতিপাদপদ্মে রত ইন্দিরা প্রসন্নমতি।
নিমেষে অদৃশ্য একি কোথা সে বৈকুণ্ঠপুর,
দেবতার পুষ্পবৃষ্টি মকরন্দে সুমধুর।
কি উৎফুল্ল জ্যোৎস্নাধারা নিষ্পন্দ পূর্ণেন্দু তারা,
সপ্রেম কি বিশ্ব আজি কার প্রেমে আত্মহারা?
যমুনা উজানগতি কা'র বাঁশী শুনে প্রাণে?
কার টানে গোপীচিত্ত প্রেমোন্মদ নৃত্যগানে?
এক হতে অনন্তের এ কি স্ফূর্ত্তি—কি বিলাস।
মদন-মোহন মূর্ত্তি,—জাগে হৃদে মহারাস।

শ্রীরসময় লাহা।

পরলোকবাসী ব্রাহ্ম ও মুসলমানধর্ম্ম।

(প্রতিবাদ)

গত কার্ত্তিক সংখ্যা নব্যভারতের "ব্রাহ্মসমাজ, ভারত ও জগতের উন্নতি" শীর্ষক প্রবন্ধে, মুসলমান ধর্ম্মের নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটী অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক পরলোকবাসী আত্মা, মিডিয়ম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা প্রবন্ধটী লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। প্রেততত্ত্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞ নহি, সুতরাং পরলোকবাসী আত্মা কি প্রকারে জ্ঞান আহরণ করেন, জানা ছিল না। প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম, তিনি আমাদেরই ন্যায় স্বমত-সমর্থনের নিমিত্ত ইতিহাস-সাক্ষ্য মাত্র

করিয়াছেন, এমতাবস্থায় তাঁহার বক্তব্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে যে আমরা একেবারে অনধিকারী, এরূপ মনে হয় না।

মিঃ ডাম লিখিতেছেন "মুসলমান ধর্ম্মের অবস্থা কি? ইহাতে কি নীতির সম্পূর্ণ আদর আছে? কখনই নহে। ইহাতেও কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান প্রকৃত ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া আছে, নীতির আদর নাই। যে পরিমাণে কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপের আদর, সে পরিমাণে নীতির আদর নাই। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে যে, মুসলমান ধর্ম্মে নীতির আদর নাই। উপবাস দ্বারা ধর্ম্ম সাধন হয় [illegible] মনে করেন, নম্র ও ন্যায় ব্যবহার, এবং পরোপকার দ্বারা ধর্ম্ম সাধন সে পরিমাণে কখনই আবশ্যক মনে করেন না। মহরম [illegible] ধর্ম্ম করা আবশ্যক মনে করেন, চরিত্রের পবিত্রতা, দয়া ও সত্যাচরণ দ্বারা ধর্ম্মাচরণ সে পরিমাণে কখনও আবশ্যক মনে করেন না।"

মনে রাখা উচিত ছিল যে, মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান নৈতিক দুরবস্থার কথা আম্মা বলিতেছেন, কিন্তু তাহা নহে, উপবাসাদি ধর্ম্মের মুখ্য আদেশগুলিকেই এক প্রকার নিরর্থক বলিয়াছেন। মহরম সামান্য সংখ্যক মুসলমানের অনুষ্ঠেয় পর্ব্ব, তাহার আমোদ আহ্লাদ ও কান্নাকাটিতে যে ধর্ম্ম হয়, মুসলমানেরাই তাহা মনে করেন না। 'মুসলমান ধর্ম্মে নীতির আদর নাই', কতকগুলি বড় লোক ও অশিক্ষিত লোকের আচরণকেই কি মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, না কোরাণ হদিসের শিক্ষাই মুসলমান ধর্ম্ম, আম্মা বলিয়া দিলে কথাটা পরিষ্কার হইত। তিনি সত্য, ন্যায়, দয়া, প্রেম ভক্তি ও চরিত্রের পবিত্রতাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়াছেন। মুসলমান শাস্ত্রে বহুকাল পূর্ব্বেই তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে। অধিকন্তু তাহা গ্রন্থে আবদ্ধ ছিল না, ধর্ম্ম-নেতাগণ জীবনেও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, মুসলমান ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রধান। কিন্তু নীতিই যে ইহার রক্ষক, অশরীরী আত্মার তাহা না হয় স্মরণ রাখিবার বা জানিবার উপায় ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এত বড় একজন প্রধান ব্যক্তি তাহা অবাধে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এই যা দুঃখ। প্রবন্ধটী তাঁহার নিজের নহে, কিন্তু [illegible] অধিকার অবশ্যই তাঁহার ছিল। আর আম্মা মহাশয়েরও অতটা অসাবধান হওয়া ঠিক হয় নাই। ইসলাম শাস্ত্রের অনুবাদক পরলোকবাসী ব্রাহ্ম গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আশ্রয় লইলে তাঁহাকে এতটা ভ্রমে পড়িতে হইত না। যাহাই হউক, ইসলাম শাস্ত্রে নীতির আদর কিরূপ, কোরাণ শরিফের কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করতঃ আমরা তাহা দেখাইতেছি। অধিক উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিব না। হদিস (প্রেরিত পুরুষের শিক্ষা) শাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উক্তি লিপিবদ্ধ আছে।

"নিশ্চয় ঈশ্বর স্বগণের প্রতিদান, উপকার ও ন্যায়াচরণ করিতে আদেশ করিতেছেন, এবং নির্লজ্জতা ও অবৈধ কর্ম্ম ও অবাধ্যতা সম্বন্ধে নিষেধ করিয়া থাকেন, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" সুরা নহল, ১৩র ৯৬আ।

"এবং অপকারের বিনিময়ে তৎসদৃশ অপকার, পরন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও সন্ধিস্থাপন করে, পরে ঈশ্বরের নিকট তাহার পুরস্কার আছে, নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না।" সুরা সুরা, ৪ র ৪০ আ।

"এবং সেই উপায়ে যাহা সৎ, তদ্ব্যতীত তোমরা অনাথ বালকের সম্পত্তির নিকটে সে (বয়ঃক্রমের) পূর্ণতায় পঁহুছা পর্য্যন্ত যাইও না এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিও, নিশ্চয় অঙ্গীকার জিজ্ঞাসিত হইবে। ইত্যাদি, সুরা বনিএস্রায়েল, ৪র, ৩৪-৩৭ আ।

"অনন্তর এ সে, যে ব্যক্তি নিরাশ্রয়কে দুঃখ দেয়, এবং দরিদ্রকে ভোজ্যদানে প্রবৃত্তি দান করে না। অবশেষে সেই উপাসকদিগের সম্বন্ধে আক্ষেপ, সেই যাহারা স্বীয় উপাসনায় হত-চেতন। সেই যাহারা কপটাচরণ করে, এবং মাউন হইতে নিবৃত্ত থাকে।" সুরা মাউন, ২—৬ আ।

"এবং তোমরা সত্যের সঙ্গে অসত্যকে মিশ্রিত ও সত্যকে গোপন করিও না, এবং তোমরা তো জ্ঞাত আছ।" সুরা বকর, ৫র, ৪২ আ।

"এবং ঈশ্বরকে পূজা কর ও তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না, এবং পিতা-মাতা, স্বগণ, নিরাশ্রয়, দরিদ্র—স্বজন প্রতি-বেশী, পরজন প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গী এবং পরিব্রাজক, এ সকলের প্রতি এবং তোমাদের হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে, তাহা-দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, যাহারা অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না।" সুরা নেশা, ৬র, ৩৬ আ।

ইসলাম শাস্ত্রে দৈনিক পাঁচ বার নমাজ পড়িবার ব্যবস্থা, সর্ব্বজন বিদিত। এর পর ও মুসলমান ধর্ম্মে ভক্তির আদর কিরূপ, আলোচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র দরিদ্রের জন্য আয়ের ৪০ ভাগের একভাগ জকাত (দান) দিতে সক্ষম মুসলমান মাত্রই বাধ্য। কোরা-ণের ৮২ স্থানে নমাজ ও জকাতের আদেশ আছে। মানুষের বিবেক বুদ্ধির উপর তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই, রাজাকে বলপূর্ব্বক জকাত আদায়ের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। হদিসে আছে "কাহারও অপকার করিলে ঈশ্বরের নিকট তাহার ক্ষমা নাই।" সত্য-কথন সম্বন্ধে প্রেরিত পুরুষ জগতকে আদর্শ জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি মিথ্যার ভয়ে ঠাট্টা তামাসা পর্য্যন্ত করিতেন না। ন্যায়পরায়ণতায় তিনি, এবং তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু-গণ, জগতে চিরকাল আদর্শ স্থানীয় হইয়া থাকিবেন। দাস দাসীগণকে তাঁহারা বন্ধু ব্যতীত আর কিছু মনে করিতেন না, অন্নে বস্ত্রে, পরিশ্রমে ও ব্যবহারে তাহারা নিজের তুল্য বিবেচিত হইত। অতুল সম্পদের অধিকারী ইসলামমণ্ডলীর নেতাগণ, পরিশ্রম করিয়া, কেহবা সাধারণের উপযোগী যৎ-সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দিন পাত করিতেন। ঐসব কাহিনী এখন উপন্যাস বলিয়াই মনে হয়। মুসলমানেরা কোরাণ ও হদিস অমান্য না করিলে আজ এত দুর্দ্দশায় পতিত হইত না। এখনও মসজিদে গেলে ইসলামের সাম্য ও একতার কিছু নমুনা দৃষ্ট হয়।

মুসলমানের উপবাস (রোজা) প্রথা বাহ্য ক্রিয়া, বলা হইয়াছে। বাহ্যের সাহায্যেই অন্তর গঠিত হয়। বাহ্যক্রিয়া পরিত্যাগ করিতে হইলে ধর্ম্মার্থে মন্দিরে গমন, স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবার রীতি, ও কীর্ত্তনাদি ত্যাগ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবস্থা বিশেষে বৈধিক পরিধান, ও আহারে আচরণে সংযম অভ্যাস, অনেক ব্রাহ্মও করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, উপবাস প্রথাটীকে আত্মা মহাশয় নিতান্তই বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন বলিয়া উহা বাহ্যক্রিয়া মনে করিয়াছেন। আমরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া উপবাসের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিতে ইচ্ছা করি না। শাস্ত্রের

লিখিত ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইলে, এক উপবাসের সাহায্যেই মানুষ দেবতা হইতে পারে। পান ভোজন পরিত্যাগ করিলেই প্রকৃত উপবাস হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযম, এবং সেই গুলিকে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত রাখাই প্রকৃত উপবাস। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে অনেকেই রোজার এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া থাকিবেন। আত্মা মহাশয় সত্য, ন্যায়, দয়া, প্রেম, ভক্তি ও পবিত্র চরিত্রকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়াছেন। মুসলমানশাস্ত্রের পাতা উল্টাইয়া দেখিলে, তাহার সব গুলিই তিনি ঐ উপবাসের মধ্যে পাইতেন। মুসলমান সমাজে প্রকৃত উপবাসকারী এখনও বিদ্যমান।

"ব্রাহ্মধর্ম্মই পৃথিবীর পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্ম হইবে" প্রবন্ধে এরূপ ভবিষ্যত বাণী করা হইয়াছে। স্বধর্ম্ম প্রচারে এরূপ উক্তি করিবার অধিকার সকলেরই আছে, ইহার বিরুদ্ধে কোন তর্ক নাই। ঈশ্বরে ভক্তি, পবিত্র চরিত্র ও জগতকে ভালবাসা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কোরাণ-প্রচারিত ধর্ম্ম কি ইহা হইতে কিছু ভিন্ন? "সত্য" ধর্ম্ম সাধনের একটী পথ, সেই সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, আত্মাকে ইসলামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইসলামের ঈশ্বরপ্রেম, ইসলামের পবিত্রতা, ইসলামের ভ্রাতৃভাব, জগতে আদর্শ স্থানীয়। "জানিও ঈশ্বর-প্রেমিকগণের উপর কোন ভয় নাই, তাহারা শোকগ্রস্ত হইবে না।" কোরাণ, শুরা ইয়ুনুস, ৭র, ৬২ আ। "যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিয়াছে, সে পুরুষ হউক বা নারী হউক সে বিশ্বাসী, অনন্তর অবশ্য আমি তাহাকে বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত করিব।" শুরা নহল, ১৬ র, ৯৭ আঃ। "এবং তোমরা পরমেশ্বরের রজ্জুকে একযোগে দৃঢ়রূপে ধারণ কর, বিচ্ছিন্ন হইও না * * *।" শুরা আলএমারণ, ১১ র, ১০৩ আ।

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম "নিশ্চয় যাহারা মোসলমান ও যাহারা মুসায়ী ও ঈশায়ী এবং যাহাদের কোন ধর্ম্ম নাই, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকার্য্য করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের পুরস্কার আছে, এবং তাহাদের প্রতি ভয় নাই, তাহারা শোক পাইবে না।" শুরা বকরা, ৮র, ৬২ আ। "হাঁ, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের দিকে আপনার আনন স্থাপন করিয়াছে এবং সৎকর্ম্মশীল, পরে তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার আছে ও তাহার সম্বন্ধে ভয় নাই, সে শোক পাইবে না।" ১৩র, ১১২আ।

জাগতিক ও পারলৌকিক যাবদীয় কার্য্য ইসলামে ধর্ম্মার্থে কৃত হয় বলিয়া, মানুষের অসম্পূর্ণ, ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের স্বাধীনতা ইসলামে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় নাই। এক জন বিবেকের নামে যাহা করিয়াছেন, আর একজন বিবেকের নামেই তাহাতে সায় দেন নাই, জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এজন্য মসলমানেরা কোরাণ, প্রেরিত পুরুষ ও অবস্থানুসারে দলপতির অনুসরণ করিতে আদিষ্ট। কোরাণের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, "ইহাতে নিঃসন্দেহ, এই পুস্তকই ধর্ম্মভীরু লোকদিগের জন্য পথপ্রদর্শক।"

"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহ হও, এবং প্রেরিত পুরুষের এবং তোমাদের আজ্ঞা-প্রকাশকের আজ্ঞাবহ হও, পরন্তু যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ কর, ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী থাকিলে তবে তাহা ঈশ্বরের দিকে ও প্রেরিত পুরুষের দিকে উপ-

স্থিত কর, ইহা উত্তম এবং পরিমাণানুসারে অত্যুত্তম।” শুরা নেসা, ৮র, ৫৯ আ। ইত্যাদি

আত্মা ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছেন, আমরাও কায়মনোবাক্যে তাহাই করিয়া থাকি; কেননা ব্রাহ্মমত ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টী প্রচার করিয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, “এখন অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।” যাঁহারা প্রকৃত মুসলমান, এবং ইসলামের উদ্দেশ্য অবগত আছেন, তাঁহারা ঘৃণা দূরে থাকুক, ইহার সাফল্যই কামনা করেন। যাহাই হউক, পরলোকবাসী আত্মার যথার্থই কিছু করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি থাকিলে, তাহা পরধর্ম্ম সমালোচনায় বৃথা ক্ষয় না করিয়া, স্বসমাজের উন্নতি সাধনে বিনিয়োগ করিলে যথার্থই জগতের উন্নতি হইবে। ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে, সমাজের দুর্নীতি ও ভক্তিহীনতা সম্বন্ধেও মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ শুনা গিয়া থাকে, মিলনের নামে ভিন্ন ভিন্ন নামের সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এসব কি কেবল বগল বাজাইয়া জয় ঘোষণ করিলেই দূর হইবে? নববিধান সমাজের কোন প্রচারককে সাধারণ সমাজের বেদীতে বসিতে দিতে, বোধ হয়, আত্মামহাশয়ই সর্ব্বাগ্রে আপত্তি উত্থাপন করিবেন। “ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ নাশ করিবে” ঘোষণা করিতে, তিনিই ত ব্রাহ্মণোচিত “চট্টোপাধ্যায়” উপাধিধারী ব্রাহ্মকে মিডিয়ম নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী বলিয়া এই কয়েকটী কথা লিখিলাম।

শ্রীআমানতউল্যা আহম্মদ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৪৭। অর্থশাস্ত্র, প্রথমকল্প, অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, সঙ্কলিত এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সুলিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

এইপুস্তক খানি বাঙ্গালীর গৌরব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডারী স্যর আশুতোষকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। যোগীন্দ্র বাবু নব্যভারতের লেখক। এই গ্রন্থও ধারাবাহিক রূপে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব আমরা এই পুস্তক সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত।

যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সেবার জন্য অকাতরে সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল কবিতা, উপন্যাস ও বাজে গল্পদ্বারা ভাষার পরিপুষ্টি সাধন হইতে পারে না। নানা দেশীয় ভাণ্ডার হইতে বহুবিধ রত্ন আহরণ করিয়া আমাদের মাতৃ ভাষাকে অলঙ্কৃত করা আমাদিগের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এবং বঙ্গদেশের ও ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় নাই। মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রাণিতত্ব, ভূতত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সুগ্রন্থাদি যতদিন বঙ্গভাষায় বহুল প্রচারিত না, হইবে ততদিন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন আকাশকুসুম। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যোগীন্দ্রবাবু চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের অর্থশাস্ত্র বঙ্গভাষায় সঙ্কলন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের এক বিশেষ অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি সকল বাঙ্গালীর ধন্যবাদের পাত্র। পণ্ডিত-

প্রবর বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন,চাণক্যের অর্থ শাস্ত্র ব্যতীতও আমাদের দেশে এসম্বন্ধে শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি চার্ব্বাক, ববরুচি ও ঘট কর্পর প্রভৃতির গ্রন্থ, লঘুচাণক্যনীতি, বৃদ্ধ চাণক্যনীতি, কামন্দকীয় নীতিসার, চাণক্য-রাজনীতি, চাণক্যনীতিবাক্যসার, চাণক্য-সার সংগ্রহ এবং অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের শান্তিপর্ব্ব বা নীতিচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আশা করি, যোগীন্দ্র-বাবু ক্রমে এই সকল লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের হস্তে উপহার প্রদান করিবেন। তাঁহার নিকট আমরা আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থনীতিরও বিশদ আলোচনা প্রত্যাশা করিতে পারি। এরূপ এক গ্রন্থ (সম্পত্তি শাস্ত্র) সম্প্রতি হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৮। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ (সচিত্র), মূল্য ১॥০, কাপড়ে বাঁধাই ২৲। গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুপদ ও ব্যাখ্যা সহিত শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্-এ, সম্পাদিত। জয়দেবের এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সম্পাদক তাঁহার সুবিস্তৃত ও সুখপাঠ্য ভূমিকায় যথেষ্ট বিদ্যাবত্তা,গবেষণা, ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ গীতিকাব্য,বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি জয়দেব-রচিত তোটক ছন্দের সংস্কৃত গীত ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বত্র জয়দেব সুপরিচিত। চাঁদবর্দ্দাই তাঁহার রাসো গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

জয়দেব অঠ্ঠং কবী কব্বিরায়ং।
জিনৈঁ কেবলং কিত্তি গোবিন্দ গায়ং।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ ভক্ত ও আরাধ্যের দ্বৈতাদ্বৈত-ভাবের যে অপূর্ব্ব অহৈতুকী প্রেম সুধা বঙ্গ-বাসীকে পান করাইয়াছেন, গ্রন্থকার বলেন, তাহা পরোক্ষ ভাবে জয়দেবেরই উদ্দীপনার ফল। পাঠকালে স্থানে স্থানে জয়দেবের কোন কোন শ্লোক জটিল ও দুরূহ বলিয়া বোধ হইতে পারে, সম্পাদক স্বয়ংও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ছন্দের অনুবর্ত্তন করিয়া তালমানলয় সঙ্গত করিয়া গান করিলে তাহা সকলেরই প্রাণ মন হরণ করিবে।

৪৯। বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী। সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতি, বৌদ্ধ বালকবালিকাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও পালিগ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ,এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ব্যতিরেকে ভারতের কল্যাণ সুদূরপরাহত। অতএব এই সকল সাধু চেষ্টার প্রতি আমাদের সকলের সহানুভূতি রাখা কর্ত্তব্য। বুদ্ধ জগতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা। তাঁহার জন্ম, শিক্ষা ও কর্ম্মভূমি ভারত বর্ষ। চট্টগ্রামে মুষ্টিমেয় বৌদ্ধ ভারতে বুদ্ধের ধর্ম্ম যত্নে পাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা অতীব আনন্দজনক।

কার্য-বিবরণীতে বঙ্গানুবাদসহ কতকগুলি পালি মূল লোকনীতিসূত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাদের অনেকগুলিতে তথাকথিত চাণক্য শ্লোকের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বিধাতা এই ধর্ম্মসভার মঙ্গল করুন।

প্রসাদী ফুল। (৬)

মিলন-ভূমি।

শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদিগকে ধর্ম্মের এমন একটী মিলন-ভূমি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রাণ ছাড়িয়া খাদ্য বিচার এবং মান ছাড়িয়া বড় মানুসী করা যেমন মূর্খের কার্য্য, আমরাও সেইরূপ মূর্খের মতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া শুধু কর্ম্ম লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম, কতক-গুলি সামাজিক রীতি নীতি ও আচার পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্নতা বা বিচিত্রতা দেখিয়া ধর্ম্মের মিলন-ভূমি খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেই মিলন-ভূমি প্রাপ্ত হইয়া আমরা একটা বিষম বিদ্বেষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি।

মনে করুন, একজন ভেকধারী বৈষ্ণব, একজন নানকপন্থী উদাসী, একজন ঈশাপন্থী পাদরী, ও একজন মুসলমান ফকীর একস্থানে বসিয়া আছেন। ইহঁাদের পরস্পরের পরি-চ্ছদে ও আচার ব্যবহারে কি বিষম বিসদৃশ। একজনের মস্তক মুণ্ডিত, গলায় তুলসীর মালা, নাসিকায় দীর্ঘ ফোঁটা ও সর্ব্বাঙ্গে হরি-নামের, কি রাধাকৃষ্ণ নামের ছাপ এবং পরি-ধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস, অন্যজনের সুদীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু এবং পরিধানে পট্টবস্ত্র বা শ্বেত-বস্ত্র, মস্তকে পাগড়ী অথবা দীর্ঘ জটা, আবার পাদরী সাহেব হ্যাট-কোট-ধারী, ফকীর সাহে-বের কণ্ঠে স্ফটিক মালা, পরিধানে বিবিধ বর্ণের বস্ত্রে নির্ম্মিত আলখেল্লা। পরস্পরের আচার ব্যবহার অধিকতর বিচিত্র। সে সকলের বর্ণনা অনাবশ্যক। বাহিরের দিক হইতে দেখিলে ইহঁাদের যে একটী মিলন-ভূমি আছে, তাহা কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহঁারা যখন অন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন বৈষ্ণব গাহিলেন "হরিসে লাগি রহরে ভাই তেরা বনত বনত বনি যাই" অর্থাৎ হরিতে লাগিয়া থাক, তোমার সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হইবে। নানকপন্থী বলিলেন "তোমার প্রত্যেকটী শ্বাস প্রশ্বাস গণিয়া গণিয়া গুরুকে অর্পণ কর"। পাদরী সাহেব বলিলেন "অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর" এবং ফকীর সাহেব বলিলেন, "আমার মন পাগলারে হরদমে আল্লাজীর নাম নিও, দমে দমে নিও নাম, কামাই নাঁহি দিও"। দেখা গেল যে, ইহঁাদের বাহ্যিক বিচিত্রতা ও বিরুদ্ধতার মধ্যেও একটা আন্তরিক একতা ও অভিন্নতা আছে; ইহঁাদের কর্ম্ম স্বতন্ত্র হইলেও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র নহে। সকলেই অবিশ্রান্ত শ্বাসে প্রশ্বাসে আরাধ্য দেবতার স্মরণ করি-তেছেন।

মনুষ্যের আকৃতি কিরূপ বিচিত্র! এক জনের বর্ণ ও গঠন আশ্চর্য্যরূপে অন্যের বর্ণ ও গঠন হইতে আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে, কিন্তু সকলেরই প্রাণরাজ্যে একটী মিলন আছে, হৃদয়ের স্পন্দন ও আভ্যন্তরিন যন্ত্রাদি এবং স্নায়ু-শৃঙ্খলার ((Nervous system) মধ্যে পার্থক্য কিছু দেখা যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার মনোরাজ্যেও

সেইরূপ, রুচি বিভিন্ন,সুতবাং আহার বিহার ও পোষাক পরিচ্ছদের বিচিত্রতা ত থাকিবেই, কিন্তু সকলের মনের গতি একই দিকে। হাজার ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিলেও লক্ষ্যের বিভিন্নতা নাই। সকলেই "সুখ"চায়, "শান্তি" চায়। কেহবা ধন দ্বারা, কেহ যশ দ্বারা, কেহ আধিপত্য দ্বারা, সংক্ষেপত কেহ সৎকার্য্য দ্বারা, কেহ অসৎ কার্য্য দ্বারা বা অন্য কোন রূপে এই সুখলিপ্সা, এই শান্তি-পিপাসাকে চরিতার্থ করিতে চায়। কিন্তু"অন্নবস্ত্র" লইয়া কেহই সিদ্ধকাম হইতে পারে না। "যে ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" মানুষের অনন্ত পিপাসা কিছুতেই সীমাবদ্ধ বস্তু লইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আজ হউক, কাল হউক, সকলকেই ঠেকিয়া শিখিয়া সেই অসীম অমৃত-পুরুষের দিকে ছুটিয়া যাইতেই হইবে। সুখ-পিপাসা ও শান্তি-পিপাসার মধ্যে ধর্ম্মের বীজ লুকাইয়া রহিয়াছে, কেহ কিছু কালের জন্য পথভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভ্রষ্ট নহে। উপায় লইয়াই বিবাদ, উদ্দেশ্য লইয়া প্রকৃতপক্ষে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই।

হিন্দুস্থানী লোকেরা দাঁতন না করিয়া জলগ্রহণ করেনা। এই নিয়মটী ইহারা এমনই ভাবে রক্ষা করে যে,মুমূর্ষু রোগীকে ঔষধ খাও-য়াইতে হইলে তাহার মুখে অন্তত একটা দাঁতন কাঠী ছোঁয়াইয়া তবে মুখে ঔষধ দিতে হয়, নতুবা জাতি যায়। বাঙ্গালা দেশে হিন্দুর ছেলের পক্ষে মুরগী খাওয়া যেমন নিন্দনীয় কার্য্য, কোন একজন খোট্টার পক্ষে দাঁতন না করিয়া জলগ্রহণ করা তদপেক্ষাও নিন্দনীয় ও পাপজনক কার্য্য। একজন লোক যতই ধার্ম্মিক হউক না কেন, দাঁতন না করিয়া জলগ্রহণ করিলে হিন্দুস্থানীরা কখনই তাঁহাকে বোল-আনা শ্রদ্ধা করিতে পারেনা। এইরূপ খুঁটি-নাটি কর্ম্ম, সকল সমাজেই আছে,যাহা করিলে অথবা না করিলে জাতি যায় এবং ঐরূপ কর্ম্ম করায় কিম্বা না করায় ধার্ম্মিক ব্যক্তিও যবন, ম্লেচ্ছ, কাফের বা হিদেন নামে অভিহিত হয়। এইরূপে বাহিরের কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি অধিক হওয়ায় ক্রমশঃ প্রকৃত ধর্ম্ম উপেক্ষিত হয় এবং ধর্ম্মের নামে বিদ্বেষ ও হিংসা জগতে প্রাধান্যলাভ করে।

কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মই তাহার অনুকূল কর্ম্মের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে। সে সমস্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু সেই ধর্ম্মটীকে লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। যাঁহারা সকল ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি এক সঙ্গে জড় করিয়া একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রস্তুত করিতে চাহেন, অথচ যে সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া সেই সকল ধর্ম্ম ফুটিয়াছে, সে সকল কর্ম্মকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের আশা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। পাঁচ ফুলের একটী তোড়া হয়, কিন্তু পাঁচ ফুলের একটী জীবন্ত বৃক্ষ হয় না। গোলাপকে পাইতে হইলে তাহার কণ্টকময় বৃক্ষ পরিত্যাগ করিলে চলিবেনা, পদ্ম ফুল ফুটাইতে হইলে কণ্টক-ময় মৃণালেই ফুটাইতে হইবে। তোমার প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রকৃতি তোমার আব-দার শুনিবেনা। খড়, তুঁষ, ও কুঁড়ো তোমার খাদ্য নহে,তুমি চাহিবে ছাঁটা বালাম কিন্তু সে বালাম চাউল গুলি খড়, তুঁষ ও কুড়ার ভিতর দিয়া ভিন্ন জন্মিতে পারে না। এ সকল পরীক্ষা-সিদ্ধ সত্য, ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাটেনা।

জড়রাজ্যই বল আর মনোরাজ্যই বল, সকল রাজ্যই নিয়মের অনুগত। শূন্য হইতে

কিছুই উৎপন্ন হয় না, সকল কার্য্যেরই কারণ আছে এবং সে কারণও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য বই আর কিছু নহে। যে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্য হইতে পরবর্ত্তী কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী কার্য্য উৎপন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার। কৃতকার্য্যতার সাক্ষী চাই, আনুমানিক মত কে শুনিবে? এইজন্যই লোকেরা যুক্তির অনুসরণ না করিয়া মহাপুরুষের অনুগমন করে, এবং এইজন্যই সহস্র সহস্র বৎসরের পরে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম প্রচারকের মধ্যে জগতের লোকেরা কদাচিৎ কোন এক ব্যক্তির কথা মানিয়া চলে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্ম্মকে অত্যধিকরূপে প্রশ্রয় দিলে অনেক বাহুল্য আসিয়া ধর্ম্মকে মলিন করিয়া ফেলে, তখন মনে হয়, দাঁতন না করিলে আর পরিত্রাণ নাই।

ধর্ম্ম এক হইলেও, দেশ কাল সমাজ ও প্রাকৃতিক ব্যাপার সকলের বিভিন্নতায় কর্ম্ম বিচিত্র। যে বৃক্ষকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিয়ত জল সিঞ্চন করিয়া বাঁচাইতে হয়, শীতপ্রধান দেশে উহাকে বাঁচাইবার জন্য কাঁচের গৃহে রক্ষা করিয়া উষ্ণ বাষ্প প্রদান করা কর্ত্তব্য। কোন ঋতুতে জলদান মহা পুণ্য, কোন ঋতুতে অগ্নি সেবন করান মহাধর্ম্ম। কোন দেশে লবণ দান অতি সামান্য কার্য্য, কোন দেশে নেমকহারামের অধিক গালি নাই, যাহার লবণ খাইল, তাহার বাড়ীতে ডাকাতগণও ডাকাতি করিতে পারে না। সকল দেশের লোকের স্বাদ গ্রহণ শক্তি একরূপ নহে, য়ুরোপীয়গণ যে পনির (cheese) খায়, তাহার গন্ধে আমাদের বমি আইসে, আমাদের ঘৃত তাহাদের পক্ষে সুখাদ্য নহে, ব্রহ্মবাসিগণ ঘৃতের গন্ধে বমি করে। সৌন্দর্য্য বোধ সব দেশের সমান নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গজেন্দ্রগামিনীর প্রশংসা, শীত প্রধান দেশের সুন্দরী চঞ্চল-চরণা; কোথাও পীত কোথাও শ্বেত, কোথাও বা শ্যামবর্ণের আদর। কোথাও ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ প্রশংসনীয়, কোথাও অরুণবর্ণ আদরণীয়। কোথাও সুন্দরী কুরঙ্গনয়না, কোথাও বিড়ালাক্ষী প্রশংসনীয়া। সংক্ষেপতঃ প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ, রুচিভেদে সমাজভেদ ও সমাজভেদে কর্ম্মভেদ ঘটে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। যাঁহারা এই পৃথিবীর *সকল দেশের ও সকল সমাজের লোককে* একপ্রকার আচার আচরণে আনিতে চাহেন, এক প্রকারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন এবং একই রুচিতে আসক্ত ও একইরূপ কর্ম্মে অনুরক্ত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। পরন্তু সকলকে এইরূপে এক ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করায় সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে জগৎকে অধর্ম্মে প্লাবিত করে। ধর্ম্মের নামে মানুষ যেরূপ অধর্ম্ম করিয়াছে, অধর্ম্মের নামে ততদূর করিয়াছে কিনা, সন্দেহ।

তবে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের কতকগুলি মূল নীতি আছে, সে গুলিকে উপেক্ষা করিতে কাহারও অধিকার নাই। ক্রোধ করিলে হিন্দুর যেমন তপস্যা নষ্ট হয়, মুসলমানেরও তেমনি রোজা নষ্ট হয়। এইরূপ চুরি ডাকাতি, ব্যভিচার, হিংসা, বিদ্বেষ, পরপীড়ন, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই নিন্দনীয় ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই নিষিদ্ধ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি যে সকল প্রবৃত্তি এই সকল অসৎ কার্য্যের প্রবর্ত্তক, সে সকলের হস্ত হইতে আত্ম রক্ষার চেষ্টা করা সকল দেশীয় সাধকগণেরই মুখ্য সাধন। এই

সাধন ক্ষেত্রে যাঁহারা একনিষ্ঠ তপস্বী, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ কখনও সম্ভবে না, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অনুরক্ত, এমন কি, এই সাধনপথে হিন্দু মুসলমানের এবং মুসলমান হিন্দুর সাহায্য ও সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন না। সুফী সম্প্রদায়ের মুসলমান এবং হিন্দু যোগীদিগের মধ্যে কিরূপ বন্ধুত্ব জন্মে, তাহা দেখিলে একান্ত সংকীর্ণ চিত্ত ব্যক্তির হৃদয়ও কিছুকালের জন্য মিলন-আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। এই সাধন ধর্ম্মের মধ্য অঙ্গ, আচার পদ্ধতি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ, এবং ধ্যান ধারণা সমাধি, আত্মদর্শন ব্রহ্মদর্শনই অন্তরঙ্গ। যাহা কিছু মতান্তর ও মনান্তর, সে সমস্তই বহিরঙ্গ লইয়া, সাধকের একটু অন্তর্দৃষ্টি হইলে বিবাদের আর স্থান থাকে না। কিন্তু হায়, সে দৃষ্টি অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। যাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রধান দশটী আজ্ঞার মধ্যে "নরহত্যা করিওনা" ইহা একটী বিশেষ আজ্ঞা, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে নরমুণ্ড লইয়া কিরূপ তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছে, ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এমন কি, বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রণহত বীরপুরুষগণের মাংস দ্বারা আনন্দ-ভোজন করিতেও ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিরা সঙ্কোচ বোধ করে নাই।

রাজনীতি লইয়া যখন একদেশবাসী এক ধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও অত্যন্ত মতান্তর ও মনান্তর নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, তখন সমাজনীতি ও গার্হস্থ্যনীতি লইয়া যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতান্তর ঘটিবেনা, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। ধর্ম্ম বস্তুটী নিত্য, সনাতন; সমাজ জিনিসটা সেরূপ নহে, উহা মানুষের মনগড়া বস্তু, প্রকৃতির তাড়নায় এবং মানব মনের বিভিন্ন আদর্শে উহা গঠিত হইয়াছে এবং প্রয়োজন ও আদর্শের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং চিরকালই হইবে। ধর্ম্ম এরূপ চঞ্চল বস্তু নহে, উহা অপরিবর্ত্তনীয়। শ্মশান কিম্বা সমাধির পরপারে যাহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকিবে না, তাহা লইয়াই মানুষ বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছে। যাহা মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যাইবে, তাহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই "এক" বস্তু, তাহা লইয়া বিরোধ নাই, মতান্তর নাই। এই মিলনভূমি যে ব্যক্তি দেখিতে পায় না, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের নামে বিরোধ উৎপন্ন করে। যাহার পাপ তাপ দেখিয়া তুমি বিন্দুমাত্র ব্যথিত হও না, তাহাকেই ধর্ম্ম দেওয়ার জন্য তুমি ব্যথিত করিতেছ। কতকগুলি বাহিরের বস্তুকে "ধর্ম্ম" আখ্যা প্রদান করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মকে জলাঞ্জলী দিতেছ। তুমি কি মনে কর যে, হিন্দু অবতার ও ঋষিগণ, মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরৎ মহম্মদ এবং মুসলমান পেগাম্বরগণ, ইহুদী ধর্ম্মের মুসা ও ইব্রাহিম, এবং ঈশা ও পিটারগণ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রেরিতগণ এবং শাক্য সিংহ ও কনফুস প্রভৃতি বৌদ্ধ যোগিগণ পরলোকে বিবাদ করিয়া কাল কাটাইতেছেন? অথবা তাঁহারা এই পৃথিবীতে চিরবিরোধের সূত্রপাৎ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?

বিশ্বাস-নেত্রে চাহিয়া দেখ, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের অনুগতগণ লইয়া প্রেমানন্দে বিরাজ করিতেছেন এবং পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া তোমাদিগের আচরণে বিস্মিত হইতেছেন।

যাহাতে মনুষ্য সমাজের অনিষ্ট না হয়, এমন সকল আচার আচরণ সকলেই স্বাধীনভাবে করিতে পারে, ইহাতে বিচিত্রতা কিম্বা বিভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু যাহা ধর্ম্ম, তাহা একই বস্তু, উহা অভিন্ন ও অপরিবর্ত্তি-

নীয়। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, সবলতা, অচৌর্য্য প্রভৃতি উহার প্রথম স্তর, এই স্তবে উত্তীর্ণ হইলে তুমি প্রবেশিকা পবীক্ষায উত্তীর্ণ হইলে; ইহাব পরে ধ্যান, ধাবণা, সমাধি, আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শন প্রভৃতি স্তবের পর স্তর অতিক্রম কবিতে হইবে। প্রবেশিকা পবীক্ষায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলকেই এক ক্ষেত্রে বসিয়া পবীক্ষা দিতে হইবে। তাহাদের পাঠ্য এক এবং পরীক্ষাব প্রশ্নও একই প্রকাবেব, পবীক্ষক একই ব্যক্তি, সাধ্য সাধন কিছুই স্বতন্ত্র নহে, এইখানেই ধর্ম্মের নিত্যত্ব এবং ইহাই সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীর "মিলন-ভূমি"।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

উভয় রামকৃষ্ণের তুলনা। (২)

(মত-বিষয়ক)

পরমহংস রামকৃষ্ণেব কতিপয় সাধু ভক্ত তাঁহাব যে সকল উক্তি গ্রন্থাকাবে প্রকাশ কবিযাছেন, তাহা হইতেই তিনি কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। আমবা দেখাইব, তিনি শঙ্কবাচার্য্যেব প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদেব অনুগত সাধক ছিলেন। পবমহংসেব উক্তি হইতে অদ্বৈতবাদ তল্লাস কবিযা বাহিব কবিতে হয, কিন্তু গোসাই রামকৃষ্ণেব অদ্বৈতবাদানুগত্য তল্লাস কবিযা বাহিব কবিতে হয় না, নিজে নিজেই বাহিব হইযা বহিযাছে। পববর্ত্তী আলোচনায ইহা স্পষ্ট রূপে দেখাইব।

গোঁসাই বামকৃষ্ণেব সম্প্রদায সোজা সোজা ব্রহ্মবাদী হইয়াও দীর্ঘকাল যাবৎ চৈতন্য মতের বাহ্য আচাব দ্বাবা আবৃত রহিযাছে। আশ্চর্য্যেব বিষয, এত আববণ সত্ত্বেও এই সম্প্রদায় নিজের পার্থক্য বজায় রাখিবাব জন্য যত্নপর রহিয়াছেন। এই পার্থক্য রাখাব যত্ন সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ কবিতেছি। এই সম্প্রদায়েব ধর্ম্মমত যে সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ বলিযা জানা যায়, তন্মধ্যে "জগমোহন-ভাগবত" নামক একখানা পুস্তকই প্রধান। এই পুস্তকেব এক খানা মাত্র প্রাচীন হস্তলিপি আখড়ার মহান্ত সমীপে বিদ্যমান—তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই হস্তলিপি (১) খানি আমাদেব নিকট কিছু কাল হইল পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মহান্ত মহাশয অনুবোধ কবিয়াছেন, এই পুস্তক আমাদেব ছাপাইতে ইচ্ছা হইলে ছাপাইতে পারি, কিন্তু উক্ত পুস্তকেব যে যে অংশে চৈতন্য মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সেই সেই অংশ ছাপাইবাব কালে যেন পুস্তক হইতে উঠাইয়া দিই।। এই অনুবোধ মহান্ত মহাশয়ের ব্যক্তিগত অনুবোধ নহে, কিন্তু সম্প্রদায়গত। একভাবে এই অনুবোধটী সম্প্রদায় হিসাবে

(১) এই প্রাচীন হস্তলিপি তুলট কাগজে উপন্যস্ত। ইহা পুথির আকারে ৩২৬ পৃষ্ঠার সমাপ্ত বৃহৎ গ্রন্থ। ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি দেখা যায় না। এই পুস্তক সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃত অবস্থা এই—গ্রন্থে যে সকল কথা ও মত বর্ণিত আছে, তাহা নিরঞ্জন ব্রহ্ম অথবা অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ-সঙ্গত। কাজেই এই মতের সহিত চৈতন্য মতের ঐক্য নাই। অথচ গ্রন্থখানির বহুস্থলেই লিখিত আছে, এই গ্রন্থে যাঁহার কথা লিখিত হইয়াছে, যাঁহা হইতে রামকৃষ্ণ গোঁসাইর মত বাহির হইয়াছে, সেই জগমোহন গোঁসাই নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের অবতার। চৈতন্য নিত্যানন্দ সহ জগমোহন গোঁসাইর জোড়াটা ভালরূপ লাগে নাই। অথচ এই জোড়া লাগানের যত্ন দ্বারা জগমোহন-মতটী চৈতন্য মতের একটা উপশাখা রূপে গণ্য হইয়া খর্ব্ব হইয়া উঠে। জগমোহন গোঁসাই রামকৃষ্ণ গোঁসাইর ঊর্দ্ধতন চতুর্থ গোঁসাই। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে সাধারণ লোকে 'জগমোহনী মত' বলিয়া থাকে। জগমোহনের মত খর্ব্ব হইয়া গেলে গোঁসাই রামকৃষ্ণের মতও খর্ব্ব হইয়া যায়। জগমোহন ভাগবতে এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত লিখিত আছে বলিয়া উক্ত গ্রন্থের সমাদর করিতে হয়, অথচ জগমোহন ধর্ম্মের সঙ্গে চৈতন্য মতের ঐক্য না থাকা সত্ত্বেও জগমোহনকে চৈতন্য নিত্যানন্দের অবতার অর্থাৎ বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করায় জগমোহন মতের খর্ব্বতা জন্মে। রামকৃষ্ণ গোঁসাই জগমোহনের মতটাই নিজের সাধনাবলে, খুব প্রকাণ্ড ও প্রভাবশালী করিয়া উঠাইয়াছিলেন। জগমোহন-ভাগবত এই জন্য এই সম্প্রদায়ে আদর ও অনাদর উভয়ই পাইয়া আসিতেছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে চৈতন্য নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য উঠাইয়া দিলে গ্রন্থখানা এই গোঁসাই সম্প্রদায়ের স্বকীয় গ্রন্থ (২) হয় বটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম মাধবেন্দ্রপুরীর হস্ত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তে আসিয়া যে বিরাট বৈভব বিস্তার করিয়াছিল, গোঁসাই-ধর্ম্ম জগমোহনের হস্ত হইতে রামকৃষ্ণ গোঁসাইর হস্তে আসিয়া সেইভাবের একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্য ইহা বৃহদ্বস্তুর সহিত ক্ষুদ্রতর বস্তুর তুলনা মাত্র।

গোঁসাই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের সঙ্গে চৈতন্য ধর্ম্মের ঐক্য না থাকিলেও, গোঁসাই সম্প্রদায় চৈতন্য মতের আচার গ্রহণ করিয়াছেন; পরম হংস সম্প্রদায সহও চৈতন্য মতের ঐক্য নাই; কিন্তু এই সম্প্রদায়ও যে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের আচারাদি গ্রহণে একান্ত নিশ্চেষ্ট, তাহা নহে; ইহাঁরাও বৈষ্ণবের ভাষা, ভাব প্রভৃতি গ্রহণ করিতেছেন, চৈতন্য-ভাগবতাদি গ্রন্থের অনুকরণে পরমহংস দেবের জীবন-চরিত পয়ারে বর্ণনা করিতেছেন। জগমোহন-ভাগবত যেমন চৈতন্যচরিতামৃতের অনুকরণে লিখিত, পরমহংস-সম্প্রদায়ও ঠিক সেইরূপ একটা না করিবেন, এমন বলা যায় না। আমরা

(২) এই গ্রন্থানুসারে জগমোহন গোঁসাই পূর্ব্বাশ্রমে বাখরগঞ্জ জেলাস্থ চন্দ্রদ্বীপে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পুরন্দর রায়, মাতার নাম সুধাবতী। জগমোহন রায় ১৪৫০ শকে চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৫৫ শকে অন্তর্হিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময়ে ইঁহার বয়স ৫ বৎসর দেখা যায়। পুরন্দর রায় একস্থানে রাজা ও সুধাবতী রাণী বলিয়া বর্ণিত। লেখা আছে,—সুধাবতীর ভগ্নী স্থানীয় রাজার রাণী ছিলেন। এবং রাজরাণী জগমোহনকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। জগমোহন ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করেন, এবং বহু তীর্থে ভ্রমণান্তে শ্রীহট্ট জেলাস্থ বৌলার জঙ্গলে আসিয়া প্রকাশ পান। বারান্তরে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এখনও বিথঙ্গলের আখড়ায় জগমোহন সমীপে একটু ক্ষুদ্রভোগ লাগাইয়া, রামকৃষ্ণ গোঁসাই সমীপে বৃহৎ ভোগ লাগান হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উভয় রামকৃষ্ণের মতই ন্যূনাধিক প্রকাশ্যভাবে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত দর্শনের অনুগত।

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের মধ্যেও ব্যবহারিক সংসারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এক প্রকার ঈশ্বর ভজন চলিয়া আসিতেছে। অদ্বৈতবাদিগণের ঈশ্বর, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা জীবের যাবদ্-জ্ঞান-স্থায়ী, ক্রিয়া-কারক ফলভেদ-যুক্ত দ্বৈত বুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত ঈশ্বর ও ঈশ্বর জ্ঞান থাকে, উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ থাকে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার পর দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না, ঈশ্বর-ভজনও থাকে না। অর্থাৎ ঈশ্বর ভজনাদি কর্ম্ম অবিদ্যা রাজ্যের এক প্রকার উৎকৃষ্ট অবস্থা বিশেষ; প্রকৃত অদ্বৈত বুদ্ধি উৎপন্ন হইবার পরে ভজনাদি থাকে না। অদ্বৈত বুদ্ধির অবস্থা ঈশ্বর ভজনের অবস্থা হইতে অনেক উর্দ্ধে। অদ্বৈত-বাদোপজীবিত যত প্রকার ঈশ্বর-ভজনের মত আছে, সকল গুলিই এই ভাবের।

এই ভাবের বিপরীত একটী ধর্ম্মমত আমাদের সমক্ষেই প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই মতের নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাঁদের মতে ইঁহাদের ভজনীয় ঈশ্বর সত্য ও নিত্য। এই ঈশ্বর যাবদ্‌জ্ঞান-স্থায়ী নহেন। জীব নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর লাভ করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর ভজনের উপরে নহে, কিন্তু নিম্নে। জীব চিরদিন ঈশ্বর ভজন করিবে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীব ঈশ্বর ভজনের উপরে উঠিতে পারে না, জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। ভক্তি ও আত্ম সমর্পণ ব্যতিরেকে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাধনান্তে জীব ঈশ্বরের রাজ্যে যাইয়া তাঁহার সেবা করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই রূপ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই ধর্ম্ম প্রথমাবস্থায় শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত বেদান্তদর্শনের, তৎপর উপনিষদ আত্মচিন্তায় ছায়ার পতিত ছিল,—এখন তাহা হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল ঈশ্বর ভজনে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। এই ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-মতের অতি সুন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য বাহ্যাচার গ্রহণ করিলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটা সুন্দর শাখা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বুঝিতে না পারিলে এই সকল মতের পরস্পর ভেদাভেদ বুঝা সহজ কথা নহে। এই সকল ধর্ম্মের ভেদাভেদ বুঝিবার জন্য শ্রীমন্মহা-প্রভুর মত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া লইতে হইবে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাহারও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের অনুমতি গ্রহণ করা সঙ্গত। আমরা সে ভাবে কোন ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসি নাই, কাজেই অনুমতি গ্রহণের আড়ম্বর করা শোভা পায় না। তবে বাধ্য হইয়া বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের এক খানা পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। আশা করি, আমাদের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের বাহিরে যাইবে না।

"যদ্যপি আপনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ কখনও ঘটে নাই, তথাপি আপনাদের প্রেরিত ও এখানে বিতরিত "নিবেদন-মালা" প্রাপ্ত হইয়া ও তাহার অনুশীলন করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা ধন্য। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব ও রাজভক্তি যেরূপ ভাবে নিবেদনমালায় আপনি গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা বড়ই মহত্ত্বের কার্য্য। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বময় এইরূপ প্রবন্ধ সকল প্রচার করিলেই যথার্থ রূপে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা এইরূপ

কার্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী ও আপনাকে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষ হইতে বিশেষ সম্মান ও ধন্যবাদ করিতেছি ও সর্ব্বতোভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের এদেশে নাগরী ভাষার ও উর্দ্দু ভাষার বিশেষ প্রচার। সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্ব সাধারণের প্রবেশ খুব কম, ইংরেজী ভাষাকে একাংশ লোকেরা বুঝিতে পারেন। বিশেষ সমুদায় হিন্দিভাষা কিম্বা উর্দ্দু ভাষাতেই প্রচারিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে পারেন। আমাদের ইচ্ছা যে, এই প্রবন্ধটী হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া এদেশে প্রচার করি। এ বিষয়ে আপনাদের সম্মতি বিশেষ ভাবে অপেক্ষনীয়। আশা করি, আপনারা হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার অনুবাদ সহ এই প্রবন্ধকে অর্থাৎ নিবেদন-মালাকে প্রকাশ ও প্রচার করিতে অনুমতি দিয়া সুখী করিবেন। ইতি

নিঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী
মন্ত্রী—বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা।
(বৃন্দাবন)

অনেকেই অবগত আছেন, কোন একটা সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের মত জানিতে হইলে, তদীয় শিষ্যদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। পিটার প্রভৃতি শিষ্যগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই খ্রীষ্টের ধর্ম্ম বলিয়া, উক্তি ও উপদেশ বলিয়া, জানি। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। কাজেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত জানিতে হইলে তাঁহার শিষ্যদিগের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদীয় ভক্ত ও পারিষদবর্গ মধ্যে যে কয়েক জন তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের উপরেই তদীয় সম্প্রদায়ের সাধ্য ও সাধন নির্ণয়ের ভার অর্পিত ছিল। তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা দ্বারাই প্রভুপাদ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই বিরাট বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাসন করিয়া আসিতেছেন। আমাদিগকে ইহাঁদের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

শ্রীমন্মহা-প্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য পাঁচজন মাত্র। যথা (১) রূপ গোস্বামী, (২) সনাতন গোস্বামী (৩) রঘুনাথ দাস গোস্বামী, (৪) গোপালভট্ট গোস্বামী, ও (৫) লোকনাথ গোস্বামী। (৬) লোকনাথ গোস্বামী জীবগণকে ভজন শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এতই নিষ্কিঞ্চন ছিলেন যে, কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-চরিতামৃতে তাঁহার নাম উল্লেখ করিবেন না—অঙ্গীকারে, শ্রীমন্মহা-প্রভুর মধুময় চরিত্রের বহু কথা তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি প্রাপ্তব্রজ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে মাত্র কৃপা করিয়াছিলেন। (৬) ও (৭) রঘুনাথ ভট্ট গোঁসাই স্বয়ং রূপ গোঁসাইর শিষ্য ছিলেন। কবিরাজ গোঁসাই রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব ও গোপাল ভট্ট গোঁসাই পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনে এই ছয় গোঁসাইই প্রধান। এই ছয় গোঁসাইর মহা বৈরাগ্য ও ঈশ্বর ভজন দর্শনে তদানীন্তন ভারতবর্ষ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি ভাবে রূপ গোঁসায়ের প্রতি সমস্ত ভাব অর্পণ করিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর মহাশয় অতি বিশদ ভাবে, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"এই মতে গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
(প্রভু) নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া।
হাট করি লেখাজোখা সুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার ভরিয়া।

সনাতনরূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার স্মউবি (সমুকি) রূপ মোহর করিলা।
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইলা তারে শ্রীবৃন্দাবন।
তাহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিগর আইলা যত স্বরূপের গণ।
কারিগর হৈয়া রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব সব কাঁদায় ধরিল।

(ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)

মহাপ্রভু গৌড়দেশের হাট ভাঙ্গিয়া হিসাব মিলাইয়া ভাণ্ডারটী রামানন্দের কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন। ইহার কতক কাল পরে রূপ সনাতন আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে মিলিত হইলেন! মহাপ্রভু রামানন্দের কণ্ঠস্থিত ভাণ্ডারটী রূপকে সমজাইয়া দিলেন। রূপ ভাণ্ডার সমজিয়া পাইয়া বান্ধিয়া বান্ধের মুখে মহাপ্রভুর মোহর মারিলেন। তৎপর ঐ মোহর করা ভাণ্ডার ও মোহর লইয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। বৃন্দাবন যাইয়া রূপ গোঁসাই ভাণ্ডারের সোণা রূপা দ্বারা মুদ্রিত অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার জন্য তথায় টাকশাল যন্ত্র স্থাপন করিলেন। ইহার পরেই তথায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ গোঁসাইর গণ স্বয়ং রঘুনাথ দাস প্রভৃতি কারিগরগণ বৃন্দাবনে যাইয়া জুটিলেন। রূপ গোঁসাই এই সকল কারিগর নিজের অধীনে পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া ভাণ্ডারের সোণা রূপা খুলিয়া নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিলেন। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব ঠাকুরগণ সেই সকল অলঙ্কার কণ্ঠে ধারণ করিলেন।

ছয় গোঁসাইর কৃত ও অনুমোদিত গ্রন্থরাশি এবং ভজন পরিপাটী অলঙ্কার শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থ যথা, হরিভক্তি-বিলাস, বৃহদ্ভাগবতামৃত, লঘু ভাগবতামৃত, রসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, ষট্ সন্দর্ভ, সর্ব্ব সংবাদিনী, বিদগ্ধ মাধব, ললিতমাধব, ভাগবতের দশম টীকা, রসামৃত ও উজ্জ্বলের টীকা, ভাগবতের-ক্রম সন্দর্ভ টীকা, বিবিধ স্তবাবলী, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি।

হরিভক্তি-বিলাস বহু বিস্তৃত বৈষ্ণব স্মৃতি। উভয় ভাগবতামৃতে উপাস্য দেবতা কৃষ্ণের তত্ত্ব-নির্ণয়। রসামৃতে ভক্তিরস সামান্যের বিবরণ উজ্জ্বলে চরম রসের উৎপত্তি, সর্ব্বসংবাদিনী নিরেট বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনের বিচার ও শাঙ্কর-দর্শনের খণ্ডন। সন্দর্ভে কৃষ্ণ ও জীবতত্ত্বাদি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত। কুসুমাঞ্জলি বিদগ্ধ-মাধব প্রভৃতি রাগানুগা ভজনের ক্রম প্রদর্শন। মূল কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ ও সনাতনকে যে সকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম বর্ণিত গ্রন্থাবলীতে সুব্যক্ত সুগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত, ভজনমত, মতের দর্শনাংশ প্রভৃতি সকলই এই সকল গ্রন্থে উপনিবদ্ধ। রূপের মোহরাঙ্কিত এই সকল গ্রন্থ দ্বারাই প্রভুপাদ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণব সমাজ শাসন করিতেছেন।

রূপ গোঁসাইর প্রতিনিধি হইলেন, তদীয় গরীয়ান্ শিষ্য রঘুনাথ ভট্ট গোঁসাই। ইনি কাশীবাসী তপন মিশ্রের মহাবৈরাগ্যশীল কুমার ব্রহ্মচারী-পুত্র। ইনি মহাপ্রভুর উপাদেশে পিতা মাতার মরণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহাদের মরণান্তে সমস্ত ধন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মধ্যে বিতরণ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে চলিয়া যান। মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা ও শিক্ষা দান করেন এবং শেষে বৃন্দাবনে রূপ গোঁসাইর হস্তে অর্পণ করেন। রূপ গোঁসাই ইঁহাকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শিষ্য করেন। ইঁহাকে দ্বিতীয় রূপ

গোঁসাই বলা যায়। ইনি ছয় গোঁসাইর অন্ততম।

এই ছয় গোঁসাই ও তাঁহাদের গণ জীবগণের সাক্ষাৎ উপদেষ্টা গুরু স্থানীয়। মহাপ্রভু জীবগণকে ইহাঁদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র ভক্তগণ তিনটী শ্রেণীতে লক্ষিত হইয়া থাকেন। এক শ্রেণীকে বলা হয় "বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবের গণ"। বর্ণিত ছয় ও তাঁহাদের অনুগ বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণী "নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর গণ"। নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ গোঁসাই ও রায় রামানন্দ-প্রমুখ আচার্য্য ও সিদ্ধ পুরুষগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্য শ্রেণীকে বলা হয়, "গৌড়দেশবাসী মহাপ্রভুর ভক্ত"। এই সম্প্রদায় মধ্যে দুই প্রভু অন্তর্ভুক্ত আছেন। দুই প্রভু সমেত শ্রীবাসাদি নিখিল গৌড়দেশবাসী ভক্ত, যাঁহারা প্রতি রথ যাত্রার সময়ে মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূর সমূহের ন্যায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে মহাপ্রভু দর্শনের জন্য ধাইয়া চলিতেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্রথমোক্ত শ্রেণী শেষোক্ত দুই শ্রেণীকে জ্যেষ্ঠ ও গুরুস্থানীয় বলিয়া মান্য করেন। ইহাঁরা সকলেই পর্য্যায় বিচারে ছয় গোঁসাইর গুরুস্থানীয়। ইহাঁদের শক্তি ও মহিমার পার নাই। কিন্তু জীবগণ ইহাঁদিগকে সাক্ষাৎ ভাবে ধরিতে পারেন না। আবার ইহাঁদের কৃপা আশীর্ব্বাদ না হইলেও জীবগণ ছয় গোঁসাইর কৃপা পাইতে সমর্থ হয় না। ছয় গোঁসাই কৃপা না করিলেও ইহাঁদের তত্ত্ব জানা যায় না। ছয় গোঁসাইর গণ বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ গুরু স্থানীয় বলিয়া সর্ব্বাগ্রে বন্দনীয়। এই সকল কথা ঠাকুর মহাশয় নিম্নলিখিত পয়ারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(১) বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ।
(বৈষ্ণবের গণ ছয় গোঁসাইর গণ।)

(২) নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দো সবার চরণ।
(মহাপ্রভুর গণ স্বরূপ রামানন্দাদি।)

(৩) নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দ হৈয়া অনুরক্ত॥
(মহাপ্রভুর ভক্ত প্রভুদ্বয় এবং শ্রীবাসাদি।)

কবিরাজ গোস্বামী রূপ গোঁসাইর শিষ্য রঘুনাথ গোঁসাইর সাক্ষাৎ শিষ্য। ইনি তৃতীয় রূপ গোঁসাই। ইঁহার স্কন্ধে গুরুতর দায়িত্ব পতিত হইয়াছিল। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সে দায়িত্ব পরিশোধ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত নামক বিস্ময়জনক গ্রন্থ তাঁহার এই দায়িত্ব নির্ব্বাহের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ছয় গোঁসাইর সিদ্ধান্তগুলি ইনি অদ্ভুত শক্তিসহকারে বাঙ্গালা ভাষায় উপনিবদ্ধ করিয়া, এবং সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত করিয়া বৈষ্ণব সাধকগণের প্রতি সুমহতী কৃপা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চরিতামৃত ভিন্ন গোঁসাইদের সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন, প্রায় অসম্ভব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবগণকে বৈধীভক্তি ও রাগানুগাভক্তি, এই দুইটী দান করেন। এতন্মধ্যে রাগানুগাভক্তি শ্রেষ্ঠতর এবং রাগভক্তের উপাদেয়। নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন মহাপ্রভুর মুখ্য কার্য্য ছিল না, রাগভক্তি প্রচারই মুখ্য কার্য্য ছিল।

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম।" (চরিতামৃত)

(কাম কামনা, ইচ্ছা। তবে কামনা ছিল কি ?)

"ব্রজের নিখিল রাগ শুনি ভক্তগণ
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম।" ঐ

(ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার বৈধ ভজনাদি।)

রূপ গোঁসাই রাগের সমস্ত কথাই বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহা বৈধী ভক্তের সঙ্গে একরূপ মিলাইয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহারা তাঁহা হইতে গুরুক্রমে উপদেশ না পাইয়াছেন, তাঁহারা উহা বিবিক্তভাবে ধারণা করিতে সমর্থ হন না। কবিরাজ গোস্বামী জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়া রাগ-ভজন একটু বোধগম্য করিবার জন্য বাঙ্গালা পয়ারে রাগের বহু কথাই বিবিক্ত ভাবে বুঝাইয়াছেন। মনে হয় যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রসনা ইহার মুখে ব্রজের নির্ম্মল রাগের কথা বলিয়া যাইতেছেন, যেন সাক্ষাৎ রূপগোঁসাই আবির্ভূত হইয়া কথা বুঝাইতেছেন। কবিরাজ গোঁসাই নিরুপায় হইয়াই এই সকল কথা বলিয়াছেন।

"এই সব সিদ্ধান্ত কহিতে না জুয়ায়।
(কিন্তু) না কহিলে কেহ ইহার অন্ত
নাহি পায়। (চরিতামৃত)

অর্থাৎ রাগভক্তির কথা ভাঙ্গিয়া বলা সঙ্গত নহে ; রাগভক্তি সম্প্রদায়ের ষোল আনা ভাব চাপিয়া পড়িয়াছে। যদি কিছু ভাঙ্গিয়া বলিয়া না যাই, তবে পরবর্ত্তী সাধকগণ রাগভজনের আর কুলকিনারা পাইবে না। বৈধভক্ত ইহার অধীকারী নহেন, অনধিকারী ব্যক্তি ভজনের কথা জানিলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে। অতএব আবৃত করিয়া রাগের কথা বলিতে হইবে।

"অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥"
(চরিতামৃত)

অতএব কিছু আবরণ দিয়া রাগভক্তির কথা বলিব। তাহা হইলে যে ব্যক্তি রসিক ভক্ত (রাগভক্ত) অর্থাৎ রাগের কিছু উপদেশ পাইয়াছে, সে-ই উহা বুঝিবে ; যে রাগের কথা জানে না, সে অনধিকারী ব্যক্তি বুঝিবে না।

"যে লাগি কহিত ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কি বা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥"
(চরিতামৃত)

যে অনধিকারী ব্যক্তির ভয়ে রাগের কথা বলিতে চাহে না, সে যদি আমার কথা না বুঝে, অথচ রাগভক্ত বুঝে, তাহা হইতে সুখের কথা আর কি হইতে পারে ?

এই জন্যই যাঁহারা রাগভজনের উপদেশ পান নাই, তাঁহাদের পক্ষে চৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার একেবারে দুর্ব্বোধ প্রহেলিকা বিশেষ। চরিতামৃতের পয়ারেই মূল গ্রন্থ, পয়ারেই গ্রন্থের সমস্ত কথা ও সিদ্ধান্ত বিন্যস্ত আছে। গ্রন্থ বাড়িয়া যাইবে ভয়ে পয়ারোক্ত বড় বড় সিদ্ধান্তের প্রমাণীভূত গোঁসায়ের বচন উদ্ধৃত হয় নাই। শ্রীবসন্তকুমার রায়।

অন্ধকারের প্রতি।

(১)

আমি তোমার বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে থাকি,
তুমি আমায় জড়িয়ে ধরে থাক ;
আমি তোমার অঙ্গ মাঝে সংগোপনে জাগি,
তুমি আমায় কাণে কাণে ডাক।

(২)

বসন খানির মত আমার সারা দেহে ঢেকে
লুটিয়ে পড়, এলিয়ে পড় এসে,
ঘুমিয়ে পড়ি চোখের পাতায় মৃদু স্বপ্ন মেখে
দুঃখভরা জাগরণের দেশে।

(৩)

বৃষ্টি পড়ে গাছের পাতায়, বাতাস বহে ধীরে;
আকাশ-পথে নিভে আছে তারা,—
এই নিশীথে এই সুযোগে, এই বিজনের তীরে
রচ তুমি আমার তরে কারা।

(৪)

রুদ্ধ কর, মুগ্ধ কর, সুপ্ত কর মোরে
লুপ্ত কর স্মৃতি তলের ব্যথা,
আমি তোমার বুকের মাঝে থাকি ঘুমের ঘোরে
পরশিয়ে স্তব্ধ কোমলতা।

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী।

হিন্দু নাম।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি পুস্তিকাতে হিন্দু নাম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা পাঠ করিলাম। লেখকের এই কথার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে যে, যেখানে হিন্দু অর্থে কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিশেষ একটী ধর্ম্মমত সূচিত হয়, সেখানে ব্রাহ্মদিগের পক্ষে হিন্দু নাম গ্রহণ করা চলে না। যেখানে আদম-সুমারির তালিকায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে ব্রাহ্মেরা কখনও সে তালিকায় হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। ব্রাহ্ম না হইয়াও যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না, এবং সামাজিক ব্যবহারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও ঐ তালিকায় হিন্দু বলিয়া পরিচিত হওয়া অসঙ্গত এবং অন্যায়। আদম-সুমারির তালিকার heading প্রস্তুত হইবার সময়ে, এ বিষয়ে যাহাতে সতর্কতা অবলম্বিত হয়, তাহার জন্য আমি একটু খানি চেষ্টা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত O' Malley মহোদয়

ইউরোপ এবং আমেরিকার ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর অধিবাসীই হিন্দু নামে অভিহিত হয়েন। সেখানে হিন্দু অর্থ ভারতবাসী। Grant Allen-এর Devil's Die নামক মনোরম কথা-গ্রন্থে মহম্মদ আলীকে হিন্দু বলা হইয়াছে, ইংলণ্ডের খ্রীষ্টানদিগের সংবাদ-পত্রেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হিন্দু অভিধা দেওয়া হইত। বিদেশে সকল স্থলেই সকল ভারতবাসীই হিন্দু বলিয়া পরিচিত। ভারতবাসী বলিয়া বুঝাইবার অন্য কোন সাধারণ নাম প্রচলিত নাই, যে নাম বিদেশে প্রচলিত হইয়াছে, উহা রক্ষা করিলে কোন দোষ হইবার সম্ভাবনা দেখি না। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় এ দেশের মুসলমানদিগকে হিন্দু বলিলে তাঁহারা আপত্তি করেন না বটে; কিন্তু স্বদেশে তাঁহারা ঐ সংজ্ঞাটিকে অবজ্ঞা সহকারে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যে শব্দ দ্বারা এ দেশের অধিবাসী মাত্রকেই সূচিত করিতে পারা যায়, এমন শব্দের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যখন অনুগ্রহ করিয়া আমার ক্ষুদ্র অভিমতি জানিতে চাহিয়াছিলেন, তখন আমি, যে ধর্ম্মে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, তাহাকে "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম" এই নাম দিয়া ইউরোপ-প্রত্যাগত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য-বিরোধীদিগের জন্য স্বতন্ত্র heading-এর প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রচলিত হিন্দু শব্দটী রক্ষা করিবার দিকে অধিক লোকেরই মত হইয়াছিল, কাজেই হয়-ত বা বাধ্য হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ্য-বিরোধীকেও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইয়াছে। হিন্দু নামের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, এখন যখন ঐ নামে কোন হীনতা সূচিত হয় না, তখন সমগ্র জাতিবাচক শব্দে ঐ শব্দটী ব্যবহৃত হওয়া অভিলষণীয়। কিন্তু ব্রাহ্মেরা বা অন্য কেহ যদি আপনাদের স্বাতন্ত্র্য জানাইতে লজ্জিত হইয়া হিন্দু নাম গ্রহণ করিতে যান, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের কারণ হয়।

ব্রাহ্মদিগের ব্যবহার এবং অভিমতির কথা লইয়া খাঁটি সাহিত্য বিষয়ক পত্রে কিছু লেখা চলে না; কিন্তু উপস্থাপিত বিষয়ের সহিত দেশের সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারের কথার সম্পর্ক আছে বলিয়া বিষয়টীর আলোচনা করিতেছি। ধর্ম্মমতের স্বতন্ত্রতা লইয়া জাতীয় নামে পার্থক্যের সৃষ্টি হইবে কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এখন আমরা আমাদের নীচতা এবং সঙ্কীর্ণতার ফলে বিরোধী ধর্ম্ম মতের লোকের সহিত এক সঙ্গে বাস করিতে পারি না। মানুষের ধর্ম্মচর্যা চরিত্র গড়িবার জন্য এবং মোক্ষলাভের জন্য হইয়া থাকে। মোক্ষ সম্বন্ধীয় বিষয় পারলৌকিক বলিয়া বিশ্বাস-ভেদে উহার জন্য ভিন্ন সাধনা হইলে কাহারও পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইতে পারে না। যিনি যে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুন, চরিত্রের অসাধুতা লইয়া তিনি কোন সমাজেই আদৃত হইতে পারেন না। যাঁহার ধর্ম্মমত যাহাই হউক, সাংসারিক দৈনন্দিন বলে সকলকেই এক উদ্দেশ্যে একই কার্য্য-আদর্শের পিছনে ফিরিতে হয়। সেরূপ স্থলে ধর্ম্মমত লইয়া লড়াই উপস্থিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম প্রচার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে হইলেও, ধর্ম্মের মতবাদ লইয়াই যে এ সংসারে অধিক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা জানিয়া শুনিয়াও আমার মন্তব্যটী লিখিয়াছি।

ভারতবর্ষের লোকদিগের মধ্যে একজন যদি সত্য সত্যই বিশ্বাস করিলেন যে, পরমেশ্বর কুমারীবিশেষের গর্ভ অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ঠিক তাঁহাকেই ধরিয়া তাহা না মানিলে তিনি মরণের পরে ঠিক্ পরমেশ্বরের ডাহিন দিকে ত্রাতাকে দেখিতে পাইবেন না, এবং নরকে পচিয়া মরিবেন, তবে আমিও তাঁহার বুদ্ধির একটু সমালোচনা করিতে পারি; কিন্তু ঐ বিশ্বাসের জন্য তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। প্রতিদিন হাজার হাজার আহাম্মকের কত উপহসনীয় কথা শুনিতেছি; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কোন আহাম্মককে তাড়াইয়া দেয় না, কিম্বা একঘরে করে না। এ দেশের লোকের মুসলমান ধর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন ধর্ম্ম অবলম্বন সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। এ দেশের লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন, কিম্বা খ্রীষ্টান হইয়াছেন, তাঁহারা যে এ দেশের লোক, তাহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে যে শব্দদ্বারা ভারতবাসী বুঝায়, তাঁহারা সে শব্দ ত্যাগ করিবেন কেন, অথবা অন্য কাহাকে সেই শব্দের একচেটিয়া ব্যবহারের অধিকার দিবেন

কেন? হিন্দু বলিলে কদাচ কোন ধর্ম্মের নাম সূচিত হয় নাই; এখনও হয় না। কেহ কি বলিতে পারেন যে, তিনি হিন্দু কাহাকে বলে, ইহার একটা সংজ্ঞা রচনা করিয়া দিতে পারেন? বলিতে পারেন কি, কেহ কোন দেবতা মানিলে অথবা না মানিলে অমুক শাস্ত্র অনুসারে তিনি হিন্দু নহেন? গো-মাংস খাইলে, যবনান্ন খাইলে, বিদেশের লোকের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিলে, মৃত্যুর পর ঐ কদাচারী লোকেরা বিষ্ণুলোকে না যাইতে পারেন; কিন্তু ইহলোকে তিনি যে ভারতবর্ষে বসিযা অহিন্দু হইলেন কেন, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। কেহ ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিলে, ব্রাহ্মণেরা তাহাকে অভিসম্পাত করিতে পারেন, ইহাই যথেষ্ট। বুদ্ধদেবের শিষ্যদিগকে প্রাচীন কালে বেদ-বাদী লোকেরা নাস্তিক বলিয়া গালি দিত; এবং সুগত শিষ্যেরাও বেদবাদীদিগকে পাষণ্ড বলিত। এই ধর্ম্ম মতের লড়াই সত্ত্বেও, সাধারণভাবে জনসাধারণের মধ্যে আহার, বিবাহ প্রভৃতি বিষযে কিছুমাত্র বাধা ছিল না। বুদ্ধের শিষ্যদিগকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে যেমন বৌদ্ধ বলা যাইতে পারে, সেরূপ ভাবে অবৌদ্ধ শ্রেণীর কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নাম পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালে এ দেশবাসী লোক-দিগের বর্ণভেদ ও কর্ম্মভেদের সংজ্ঞায নাম-করণ হইযাছিল; ধর্ম্মের বিশেষত্বের হিসাবে বৌদ্ধ, শৈব, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতির আখ্যা ছিল, কিন্তু ঐ cross divisionএ বর্ণিত লোকদিগের কোন সাধারণ সংজ্ঞা ছিল না। অতি প্রাচীন কালেও বিদেশের যবনাদি জাতির লোকেরা সিন্ধু নদীর লক্ষণে উপলক্ষিত করিয়া যাহাদিগকে হিন্দু বলিতেন, দেশের অধিবাসী হিসাবেই তাহাদিগকে সেই কথা বলিতেন। আমরা যদি হিন্দু শব্দটা কোন সম্প্রদায় বিশেষকে একচেটিয়া করিতে না দিই, এবং মুসলমানেরাও যদি এই নাম গ্রহণে কুণ্ঠিত না হযেন, তবে অল্পদিনের মধ্যেই শব্দটা ভারতবাসী অর্থে প্রচলিত এবং সুবোধ্য হইয়া যাইবে। খুঁজিয়া পাতিয়া নূতন নাম সৃষ্টি করা অপেক্ষা যে শব্দ চলিয়া আসিতেছে, তাহারই প্রয়োগ শুদ্ধতরভাবে করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় রাজা যে মন্ত্রের অধিকারী ব্রাহ্মণ-দিগকে তুচ্ছ করিতেন, এবং ব্রাহ্মণেরা কেবল তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিয়াই নিরস্ত হইতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ঋষিদিগের প্রার্থনার মধ্যে পড়িতে পাই যে, তাঁহারা এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে দাম্ভিক ক্ষত্রিয় রাজারা তাঁহাদের গোরু আত্মসাৎ করিয়া কাটিয়া খাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহা-দের সুন্দরী যুবতী পত্নী ধরিয়া লইয়া গিয়া কিছুদিন ঘরে রাখিবার পর অনেক অনুনয়ে ফিরাইযা দিয়াছেন, এবং অনেক সময়ে তাঁহাদের গাযে থুথু দিয়াছেন। তাহার জন্য ব্রাহ্মণেরা অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহা-দিগকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ইন্দ্রকে অনু-রোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-বিরোধী বলিয়া, তাহারা যে ক্ষত্রিয় নয়, কিম্বা রাজা নয়, একথা বলিতে পারেন নাই,—বলিবার অধিকারও ছিল না। এ কালের যদি কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করে, তবে ব্রাহ্মণ তাহার বাড়ীতে আহার না করিতে পারেন এবং দলা-দলি করিতে পারেন। ইহার বাড়া ব্রাহ্মণের এমন সাধ্য নাই, এবং কাহারও এমন সাধ্য নাই যে, ব্রাহ্মণ্য-বিরোধীকে দেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। ঠাকুর-দেবতা

মানেন না বলিয়া ব্রাহ্মকে যদি কেহ নাস্তিক বলিয়া গালি দেন (কেননা প্রাচীন কালে বেদ না মানিলেই লোককে নাস্তিক বলিত) তবে ব্রাহ্মও তাহাকে আপনার অভিরুচি অনুযায়ী কিছু বলিতে পারেন। কেহ ইউ-রোপে গেলে কিম্বা যবন সংস্পর্শে থাকিলে যদি পূজারি ব্রাহ্মণ তাহাকে অহিন্দু বলেন, তবে সে ব্যক্তিও ঐ ব্রাহ্মণকে অহিন্দু বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে।

এ স্থলে এ কথা উল্লেখ-যোগ্য যে, সাহস পূর্ব্বক আপনার দাবি প্রতিষ্ঠিত না করায় অনেকে "নাই" পাইয়াছে। বটকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মেরাও নাকি এখন পূর্ব্বের মতন সাহস করিয়া আপনাদের মত এবং অধিকার লইয়া মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারেন না। সৎ সাহসের এই অভাবের কথা শুনিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে তেজে "একঘরে" গ্রন্থ-খানি লিখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে যদি ঐ তেজ দেখা দিত, তবে আজ সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইতে পারিত। যাঁহারা জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা তুচ্ছ করিয়া, বিদেশে যবনদিগের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া বাস করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, এ কালে তাঁহারা এবং তাঁহাদের মত শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সমা-জের নেতা, এ কথা তাঁহারা নিজেরা একটু বুঝিয়া লইলে কদাচ তাঁহাদের মাথা সঙ্কীর্ণ-চেতা কুসংস্কারান্ধ লোকদিগের নিকট নত হইত না। এখন ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা হাই-কোর্টের ব্যবহারজীবীদিগের নিকট লইতে হয়; মুক্তির ব্যবস্থা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত সত্য হইতে গৃহীত হয়; দেশের ধনসম্প-দাদি রক্ষার উপায় ইউরোপীয় শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে অবগত হইতে হয়। এখন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নবদ্বীপ বা ভাটপাড়ার কাছে, সাংসারিক বুদ্ধিতে কোন লোকই যায় না; প্রাচীন সংস্কার বশতঃ যাঁহারা যাইয়া থাকেন, তাঁহা-রাও সমাজের নেতাদিগের দৃঢ় দৃষ্টান্ত বেশী করিয়া দেখিতে পাইলে, অতি শীঘ্র নূতন পথ অবলম্বন করিবেন। আমরা হটিয়া গিয়া কুসংস্কারের কাছে মাথা নত করিয়া নিজে-দের বিশ্বাস এবং ব্যবহারকে লুকাইয়া কদাচ হিন্দু নাম লইব না। কিন্তু হিন্দু অর্থে যখন ভারতবাসী সূচিত, তখন আপনার দাবিতে জোর করিয়া দন্তসহকারে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিব, এবং ঐ শব্দ কেবল মাত্র কতকগুলি কুসংস্কারগ্রস্ত ব্যক্তিকে এক-চেটিয়া করিতে দিব না। জাতীয় প্রয়োজনে শব্দটীর আবশ্যকতা আছে বলিয়াই এ বিষয়ে এত কথা লিখিলাম।

শারীরিক, মানসিক, নৈতিক প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতির জন্যই যে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিবারের প্রয়োজন আছে, এবং কোন একটী ভৌগো-লিক সীমার মধ্যে অসংখ্য পরিবারের লোকের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যে একটী নির্দ্দিষ্ট জাতীয়তার প্রয়োজন আছে, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমাদের কোনরূপ বিশ্বপ্রেম, পারিবারিক প্রেম বা জাতীয় প্রেমকে উপেক্ষা বা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে না। কাজেই সমগ্র জাতির অভিধাজ্ঞাপক একটী শব্দের যে প্রয়োজন আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি, হিন্দু শব্দ যে বহুকাল হইতে ভারতবাসী অর্থে ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে, তাহাও বলিয়াছি; এবং এখনও যে ইউ-রোপ্ প্রভৃতি দেশে সকল ভারতবাসীই হিন্দু

নামে অভিহিত হয়েন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি, আশা করি, আমরা সকলেই আপনাদের সৎ-সাহসে, আপনাদের মত এবং ব্যবহার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দু নাম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বর্ণ-তত্ত্ব। (২)

আমরা হেডেনের প্রণালী লম্বন করিয়া মানবের শ্রেণী বিভাগ করাই সঙ্গত বোধ করি, অর্থাৎ কেশের বর্ণ ও গঠন আমাদিগের মূল অবলম্বন হইবে। অন্যান্য ভেদ-চিহ্ন আনুষঙ্গিক রূপে উল্লেখ করিব মাত্র।

উপরে যে সকল ভেদ-চিহ্নের উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত অন্য চিহ্নও অবলম্বন করা যায়:--যেমন হস্ত পদাদির অস্থির দৈর্ঘ্য, বিশেষ বিশেষ আভ্যন্তরীয যন্ত্র সকলের সংস্থান ও গঠন, কোন কোন বাহ্যিক অঙ্গের গঠন—ইত্যাদি। ঐক্য অথবা পার্থক্যও কেহ কেহ অবলম্বন করিয়াছেন, দেখা যায়। কিন্তু তদ্রূপ করা সঙ্গত বোধ হয় না।

সকল প্রাণীই পরিবর্ত্তনশীল, মানবও পরিবর্ত্তনশীল। যে সকল পরিবর্ত্তনের কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাদিগকে "স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন" নাম দিয়া আমাদিগের অজ্ঞতা প্রস্থন্ন রাখি। এ পরিবর্ত্তন সকলের সমান অনুপাতে হয় না। এই হেতু মানবে মানবে জন্মগত প্রভেদ থাকিবেই। তাহাদিগের একই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা একই লক্ষণ এই হেতু বশতঃ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবেই। জন্মগত একতা থাকিলেও এ ফল অনিবার্য্য। এ এক শ্রেণীর পার্থক্য। তার পর, নানা জাতীয় মানবের যৌন সংসর্গ বশতঃ নানাপ্রকার সঙ্কর জাতিতে পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। সাংকর্য্য প্রভেদ উৎপাদনের এক প্রধান কারণ। এ কারণ বশতঃও মানবে মানবে প্রভেদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল এবং পূর্ব্ব-কথিত অন্যান্য কারণ প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে, কেশের বর্ণ ও গঠনকে মূল অবলম্বন করিলে এবং অন্যান্য ভেদচিহ্ন অথবা ঐক্যকে আনুষঙ্গিক ভাবে গ্রহণ করিলে সকল গুলির সমবায়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। তদ্ভিন্ন কোন একটী লক্ষণ অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা উচিত হইতে পারে না।

এই প্রণালী অনুসারে পণ্ডিত হেডেন নিম্ন লিখিত রূপে মানবের শ্রেণী বিভাগ করিয়া-

(১) কুঞ্চিত কেশ।

(ক) খর্ব্ব কায়; কৃষ্ণবর্ণ। যথা, মালয়, সুমাত্রা, আণ্ডামানবাসীগণ, মধ্য আফ্রিকার নিগ্রিটোগণ।

(খ) খর্ব্ব কায; পীতবর্ণ। যথা, দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট্‌গণ।

(গ) খর্ব্ব অথবা দীর্ঘকায়; কৃষ্ণবর্ণ। যথা, নিগ্রো, পাপুয়ান্ প্রভৃতি।

(২) কুণ্ডল-কেশ।

ইহারা অধিকাংশই দীর্ঘ করোটী। নানা

বর্ণ। দীর্ঘ ও খর্ব্ব।

(ক) দীর্ঘ করোটী; কৃষ্ণবর্ণ। যথা, লঙ্কার বেদিয়াগণ, কাদির প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলা জাতি, দ্রাবিড়ীয়গণ, অষ্ট্রেলীয়গণ, ইথিওপিয়ান্ প্রভৃতি।

(খ) দীর্ঘ করোটী; কটাবর্ণ। যথা, ইণ্ডো আফ্গান জতি।

(গ) দীর্ঘ করোটী, ফর্সা বর্ণ। যথা, আরবীয়গণ, ভূমধ্যস্থ সাগরতীরস্থগণ।

(ঘ) দীর্ঘ করোটী; শ্বেত ও পীত বর্ণ। যথা উত্তর উইরোপীয় নর্ভিক্গণ।

(ঙ) মধ্যম করোটী; পীতবর্ণ। যথা, জাপানের আইনুজাতি।

(চ) প্রশস্ত করোটী; ফর্সাবর্ণ। যথা, আল্পল্ পর্ব্বতবাসিগণ।

(৩) সরল কেশ।

ইহারা প্রধানত আসিয়া এবং আমেরিকাবাসী। করোটীর আকৃতি ত্রিবিধই আছে। বর্ণ নানাবিধ।

(ক) প্রশস্ত করোটী, পীতবর্ণ। যথা, ইউরাল ও আল্টাইবাসী, মঙ্গোলীরা, কোরিয়া, চীন ও তিব্বত দেশীয়গণ, ভারতলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ-বাসিগণ।

(খ) দীর্ঘ করোটী, পীত ও কটা বর্ণ। যথা, এস্কুইমক্স প্রভৃতি।

(গ) মধ্যম অথবা প্রশস্ত করোটী। যথা, পেটাগোনীয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন অধিবাসিগণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন বিভাগই ভ্রমশূন্য গণ্য হইতে পারে না। পাঠক দেখিবেন, উপরে বাঙ্গালী জাতির স্থান নির্দ্দেশ করা হয় নাই। না হইলেও ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহারা সরল কেশ শ্রেণী-ভুক্ত। যদিও কোন কোন স্থলে কুণ্ডল-কেশও দেখা যায়, উহা দ্রাবিড়ীয় সাংকর্য্যের ফল বিবেচিত হইতে পারে। যাহা হউক, এই জাতিকে সরল কেশ ও (এক্ষণে) কৃষ্ণবর্ণ প্রশস্ত করোটী শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট ফর্সাবর্ণ ও পীতবর্ণ ব্যক্তির অভাব নাই। কেহ কেহ ইহাদিগকে নানাবর্ণ বলিতে পারেন। এ কথা অসত্য নহে; এ লক্ষণকেও দ্রাবিড়ীয় এবং মঙ্গোলীয় সাংকর্য্যের ফল বিবেচনা করা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বংশানুক্রমিক স্থায়ী বর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনেও স্থির থাকে।* পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় না। সুতরাং নানাবর্ণত্বকে সাংকর্য্যের ফল বিবেচনা করা যায়। বাঙ্গালীগণের করোটীর মাপ, বিশেষতঃ নাসিকা ও হনুর মাপও অনির্দ্দিষ্ট। বোঁচা, চেপ্টা, মোটা, উচ্চ, সরু, তীক্ষ্ণ প্রভৃতি নানারূপ নাসিকা; গোল, চৌকা, চেপটা প্রভৃতি নানাবিধ মুখ-গঠন;—বর্দ্ধিত চোয়ালি ও সম-চোয়ালি† ভেদে দ্বিবিধ হনু; দীর্ঘকায়, খর্ব্বকায় ও মধ্যমকায় ভেদে নানা প্রকার দৈর্ঘ্য—এই সকল বাহ্যিক প্রভেদানুসারে ‡ এবং আভ্যন্তরীয় কতিপয় লক্ষণ ও আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান ধর্ম্ম বিশ্বাস আদি দ্বারা এই জাতির সাংকর্য্য প্রতিপন্ন করা যায়। প্রধানতঃ দেহের বর্ণ ও কেশের গঠনই এস্থলে বিশেষ

* Perhaps when once fixed pigmentation is a fairly constant character The Races of man p 2 Also cf পরবশতা—বর্ণ।

† Prognathous; Orthognathous.

‡ যে রূপ ভেদ সহোদরগণের মধ্যেও থাকে, এস্থলে সেরূপ ভেদের কথা বলিতেছে না। কিন্তু যেরূপ গুরুতর প্রভেদ বশতঃ পণ্ডিতগণ শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন, তাহারই কথা বলিতেছি।

বিবেচ্য। যাহা হউক, চীন ব্রহ্ম দেশীয়গণের সহিত পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং আসামবাসী বহু নবনারীর মুখের অবয়ব একই প্রকার। ইহা দেখিলেই বুঝা যায়। ঐ সকল স্থলে মঙ্গোলীয় সংমিশ্রণ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে দ্রাবিড়ী সংমিশ্রণ অধিক থাকা বিবেচনা হয়। কিন্তু মোটের উপর বাঙ্গালী জাতিকে ককেশীয়-মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ীয় বলা যাইতে পারে। ইহাদিগের ইতিহাসও এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

উপরে মানব জাতিকে যে ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল, তাহা পরে আরও বিশদ হইবে। বিভিন্ন জাতির স্বভাব, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতিও উল্লেখ করা যাইবে। অবশেষে মানব জাতির বিভিন্ন এবং দূরবর্ত্তী শাখা মধ্যেও কেমন আশ্চর্য্যজনক ক্রিয়া-সাম্য ও ভাব-সাম্য দেখা যায়, তাহাও সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে, তখন বুঝা যাইবে, বর্ণতত্ত্ব-শাস্ত্র কি গভীর শিক্ষার আধার।

শ্রীশশধর রায়।

কাশীবাস।

৩। মঙ্গলনাথ স্বামী।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

ঈশোপনিষৎ, ১।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র।

তৃতীয় মুণ্ডকে ২য় খণ্ড, ২।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।

২১৪, অষ্টমোল্লাসঃ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

এক দিন সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিতেছিল। তথাপি আমি আমার বারান্দায় ইজিচেয়ারে (আরামকুরসীকে) বসিয়া একাগ্রচিত্তে তুকারামের ভঙ্গ পড়িতেছিলাম। এই সময় নানাকারণে আমার মন কেমন এক প্রকার উচাটন হইয়াছিল, শান্তির জন্য প্রাণে দারুণ ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মচারী সাধু বলিয়াছিলেন, 'সৎসঙ্গ কর, সাধুর উক্তি ও সাধুজীবনী পাঠ কর, ধর্ম্মে মতি হইবে।' তাই নিষ্ঠার সহিত তুকাজীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ক্রমে তাহা নেশায় পরিণত হইয়াছিল। তখন বাসায় আর কেহ ছিলনা, আমি একা। সেই মুহূর্ত্তে, আলোকও আঁধারের মিলনকালে, দিবা ও নিশার সন্ধিস্থলে, গঙ্গাসরযূর সঙ্গমক্ষেত্রে, শান্তি ও অশান্তির সংগ্রামে, একাকিত্ব সাধনসময়ে একজন আসিলেন, তিনি সাধু মহাপুরুষ। তিনি শ্যামবর্ণ, সুদীর্ঘ, বলিষ্ঠ, ধীর, স্থির, অল্পভাষী ও প্রৌঢ়। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, বদনমণ্ডল গুম্ফ ও শ্মশ্রুবর্জ্জিত, পরিধানে গৈরিক বসন, অঙ্গে আজানুলম্বিত গৈরিক অঙ্গরাখা, হাতে একটী গোলাপফুল। সন্ন্যাসী আসিলে আমি প্রণাম করিয়া বসিবার নিমিত্ত ইজিচেয়ারখানি ছাড়িয়া দিলাম। তিনি উপবেশন করিয়া আশীর্ব্বাদসহ ফুলটী আমার হাতে দিলেন।

অতিথিকে সাধারণ ভিখারী সাধু অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র দেখিয়া আমার জিজ্ঞাসা করিতে কৌতুহল হইল,—

মহারাজকা আস্থান কাঁহা হায়?

সাধু বলিলেন 'হৃষীকেশ'।

আমি শুনিযাছিলাম, হৃষীকেশে বহুসাধুব আশ্রম আছে। জিজ্ঞাসা কবিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'হাঁ হায, গির্ণাবমেঁ ভি হায।'

আমাব মনে ঐ কাবণে হৃষীকেশ দর্শনে একটু অভিলাষ ছিল, সুতবাং জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হৃষীকেশে এখন প্রধান সাধু কে?'

সাধু। মঙ্গলনাথ স্বামী।

আমি। তাঁহাব বিশেষত্ব কি?

সাধু তাঁহাব স্বভাবসিদ্ধ ধীবতাব সহিত উত্তব দিলেন, 'উনকী বাক্‌সিদ্ধি হায।'

আমাব দুর্ব্বলতা নিজেব পবিচয সাধুকে একটু জানাইযা দিতে আমাকে ব্যগ্র কবিল। আমি না বলিযা থাকিতে পাবিলাম না যে, আমি হবিদ্বাব ও কঙ্খাল গিযাছিলাম, সেখানেও অনেক সাধুসমাগম হয। সন্ন্যাসী শুনিয়া বলিলেন, 'হাঁ, লেকিন সাংসাবিক লোগ যাসেঁ বেহ্‌ সাধু পহচান নেহীঁ সক্‌তে হৈঁ। উয়েহ্‌ তো কুছ সমঝতে নেহীঁ, ইসলিযে সাধুলোগ সংসাবিক বাৎচিৎ কবকে উন্‌কো বিদা কর দেতে হৈঁ।'

সাধু আব বসিলেন না। চলিযা যাইতে উদ্বিগ্ন হইলেন। আমি ভোজনেব জন্য সামান্য যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য কবিলাম, তাহা অনেক পীড়াপীড়ি ও জিদ করাব পব তিনি গ্রহণ কবিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত বহু অনুসন্ধান কবিযাও সেই মূর্ত্তিব আব দর্শন পাই নাই।

কিছুদিন অতীত হইলে এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আসিয়া নগবপ্রান্তে আম্রকানন আশ্রয় করিলেন। শুনিলাম, তিনি ভাবতেব সকল তীর্থ ভ্রমণ কবিয়া আসিয়াছেন। বজনীব অন্ধকাবে সেই আম্রকাননের শুষ্কপত্রেব উপব বসিয়া সন্ন্যাসীর নিকট হৃষীকেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সাধু বলিলেন যে, তিনি হৃষীকেশে বাস কবিযাছিলেন। মঙ্গলনাথ স্বামীব কথা জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি বাঙ্গালীব স্বভাবসিদ্ধ চপল চটুলভাবে কটাক্ষ কবিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মঙ্গলনাথ স্বামী আছেন। তিনি খুব বিদ্বান্, সন্দেহ নাই। আব কোন সাধুত্বেব বিশেষত্ব তাঁব আছে কিনা, বলিতে পাবি না।"

বাঙ্গালী দাম্ভিক, অহঙ্কাবী ও হিংসুক। জগতেব আব কেহ বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধুতায় তাহাব সমকক্ষ, একথা সে সহজে স্বীকার কবিতে চাহে না। সন্ন্যাসীব বেশ গ্রহণ কবিলেও বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিয়া যায়। হায আমবা!

পূজাব অবকাশে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তাব বাবুব সহিত বিন্ধ্যাচলে পবামর্শ হইল যে, তিনি হৃষীকেশ যাইতে প্রস্তুত হইলে আমি তাঁহাব হবিদ্বাব যাত্রায সঙ্গী হইব। কাশী ছাড়িয়া হবিদ্বাবেব পথে গাড়ীতে বসিয়া ছল ছল নেত্রে তিনি তাঁহাব জীবনেব একটী গোপনীয় বিশেষ ঘটনা উল্লেখ কবিলেন। তখন বুঝিলাম, হবিদ্বাব যাইতে তাঁহাব এত আগ্রহ কেন। সুতবাং আমিও আমাব হৃষীকেশ গমনেব উদ্দেশ্য তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক কহিলাম।

লক্‌সাব ষ্টেসনেব কাছাকাছি জনৈক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকেব সহিত আলাপ হইল। তিনি কঙ্খাল, হৃষীকেশ ও লছমন ঝোলা গিযাছিলেন। সাধুদিগেব কথা উপস্থিত হইলে স্বামী মঙ্গলনাথেব নাম করিলাম। তিনি বলিলেন, "অত বড় জ্ঞানী সাধু এ অঞ্চলে আব নাই।"

কঙ্খালে পৌছিযা বামকৃষ্ণসেবাশ্রমে স্বামী কল্যাণানন্দের আশ্রয়ে আমরা অবস্থান

করিলাম। কল্যাণানন্দ হরিদ্বারে সুপরিচিত। তিনি ধীর প্রকৃতি, কর্ম্মী ও অতি অল্পভাষী। স্বর্গীয় বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত নবসেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। হৃষীকেশ যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, যাইতে বিশেষ কষ্ট হইবে। ডাক্তার বাবুর একটু অনিচ্ছা এবং আমার অত্যন্ত উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে কিনা, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে বলিতে হইল, মঙ্গলনাথ স্বামীর দর্শনই হৃষীকেশ যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য। মঙ্গলনাথের সম্বন্ধে আলোচনা হইল। কল্যাণানন্দ বলিলেন, "এরূপ ত্যাগী সাধু হরিদ্বারে আর কেহ আছেন বলিয়া আমি জানি না।" তখন বুঝিতে পারিলাম, মঙ্গলনাথ বিদ্বান্, জ্ঞানী ও ত্যাগী। সন্ন্যাসীর সাধুত্বের আর কি নিদর্শন আবশ্যক?

স্বামী কল্যাণানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি মঙ্গলনাথ স্বামীর ত্যাগের কি পরিচয় পাইয়াছেন। কল্যাণানন্দ উত্তরে বলিলেন, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের এই ইষ্টকগৃহই তাহার পরিচয়। কলিকাতা মনোহর দাসের গলির কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি মঙ্গলনাথ বাবাকে কিছু অর্থদান করিতে হইবে বলিয়া উইলে লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মরণান্তে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ৩ সহস্র মুদ্রা লইয়া স্বামী মঙ্গলনাথের নিকট উপস্থিত হইল। মঙ্গলনাথ কিছুতেই অর্থ গ্রহণ করিবেন না, তাহারাও ছাড়িবে না। তাহারা আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিল, মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রস্তাব করিল, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। দুই তিন দিন অপেক্ষা করিয়া অবশেষে তাহারা নিবেদন করিল, 'যদি আপনার নিজের কোনপ্রকার সেবার জন্য এ অর্থ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে আদেশ করুন, আমরা কাহাকে অর্থ দান করিব! আপনাকে টাকা না দিলে আমাদের উইল প্রবেট নেওয়া হইবে না।' মঙ্গলনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'ঐ বাঙ্গালী বাবুরা সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অর্থের বড়ই অনটন। যাও এই টাকা উহাদিগকে প্রদান কর।' সেই অর্থে সেবাশ্রমের ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কখালের সাধুরা বলিলেন, মঙ্গলনাথ গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বার্ষিক প্রায় ৫০ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি ছিন্ন-পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর, শনিবার, ১৯০৯, প্রত্যূষে আমরা কখালে পৌঁছিয়াছিলাম। সেইদিন রজনীতে স্বামী কল্যাণানন্দের সহিত উল্লিখিত কথাবার্ত্তা হইল। পরদিন আশ্রমের স্বেচ্ছা-সেবক বরিশালবাসী উৎসাহী যুবক লাল-মোহন বাবুর সহিত শঙ্করাশ্রমে যাইয়া হৃষী-কেশের পথ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। সাধুরা বলিলেন, যাইতে কষ্ট হইবে, যেহেতু পথের সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কথা প্রসঙ্গে মঙ্গল-নাথ স্বামীর নাম হইল। তাঁহারা বলিলেন, স্বামী পূর্ব্বদিন কখালে আসিয়াছেন। আনন্দে প্রাণ পূর্ণ হইল, ভক্তিভরে বিধাতার চরণে প্রণিপাত করিলাম। ডাক্তার বাবু বলিয়া উঠিলেন, তবে হৃষীকেশ না গেলেও চলিবে। আমি উত্তর করিলাম, হাঁ আমার আর তত আগ্রহ নাই।

চেতন দেব অবধূতের ছাউনী-সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়াশ্রমে মঙ্গলনাথ আছেন শুনিয়া ত্বরা করিয়া আমরা তথায় গমন করিলাম। ডাক্তার বাবু, লালমোহন বাবু এবং

সিংহভূমবাসী জনৈক বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণসন্তান (বেদান্তের ছাত্র) সঙ্গী হইলেন। আশ্রমের ভিতর অতসী পুষ্পের জঙ্গল জন্মিয়াছিল। রিক্তহস্তে সাধু দর্শনে যাইতে নাই, আমি কয়েকটী অতসী ফুল তুলিয়া লইলাম। বিদ্যালয়াশ্রমের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে উচ্চ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটী ইষ্টকগৃহে এক-খানি খাটিয়ায় চাদর বিছান ছিল। মঙ্গল নাথ বাহিরে গিয়াছিলেন। লালমোহন স্বামীর বিনা অনুমতিতে বসিতে নিষেধ করিলেন। আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। স্বামীজী শীঘ্রই আসিলেন, আমরা দণ্ডবৎ হইলাম। তিনি প্রসন্নমুখে সদয়ভাবে বসিতে বলিলেন। তখন বেলা ৯॥ টা।

স্বামী মঙ্গলনাথ প্রশান্তমূর্ত্তি, দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ, শীর্ণদেহ, প্রাচীন, সম্মুখের দুই তিনটী দন্তহীন, দেখিতে অনেকটা কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামীর ন্যায়। তাঁহার সহাস্য বদনমণ্ডল প্রসন্নতাপূর্ণ। স্নিগ্ধদৃষ্টিপূর্ণ উজ্জ্বল বড় বড় ভাসমান চক্ষুদুইটী তীক্ষ্ণবুদ্ধিপরিচায়ক। তিনি নাথ সম্প্রদায় ভুক্ত, কিন্তু 'কাণ ফোড' নহেন। শুনিয়াছিলাম, কম্বুলে বাবার দেহত্যাগের পর হৃষীকেশ, হরিদ্বার ও কন্খালে স্বামী মঙ্গলনাথের ন্যায় সাধু আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

স্বামীজী হাসি হাসি মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমরা কবে হরিদ্বার গিয়াছি, বাড়ী কোথায়, বাসা কোথায় করিয়াছি, কবে ফিরিয়া যাইব, কলিকাতার গোলযোগের (রাজনৈতিক) অবস্থা কি, প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণভাবে প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার মধুর বাক্য-ঝঙ্কারে কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু উত্তর দিলেন। আমি নিরবে এক দৃষ্টিতে সেই জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষের প্রসন্ন আনন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহার বাক্য-সুধা পান করিতে লাগিলাম। হরিহর ছত্রের নাম করিয়া ছাপরার পরিচয় দেওয়া হইল। আমি এই সুযোগে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ কভি ছত্র গয়েথে?"

স্বামী। নহি।

আমি। সেখানেত অনেক সাধু-সমাগম হয়।

স্বামী। বহ্ তেজাবতকী জগহ হৈ।

এই সকল কথার পর স্বামীজী চুপ করিয়া একটী ফুল হাতে লইয়া এক একবার নাড়িতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু বাসায় ফিরিতে উচাটন হইলেন। আমি কিছুতেই উঠিলাম না। আমার মনে সেই কথা জাগিতেছিল, সাংসারিক লোকদিগকে সাধুরা কেবল সাংসারিক কথা বলিয়াই বিদায় দেন।

প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, স্বামীজী নীরব, আমরাও চুপ। পরে তিনি একটু মৃদু হাসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার আভাস মাত্র নিম্নে লিখিত হইল। কিন্তু তাঁহার সাধনাপূত জীবনে পরীক্ষিত ও পবিত্র কণ্ঠোচ্চারিত, সরস, মধুর, সজীব বাক্য প্রবাহে শ্রোতার প্রাণে যে অপূর্ব্ব ভাবোন্মাদ আনয়ন করিতে পারে, তাহা যিনি উপলব্ধি না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ধারণা করা সুকঠিন।"

"আমরা সকলেই এখন পরলোকে। এজন্য পূর্ব্বজন্মের পরলোক এখন স্বলোক হইয়াছে—যাহা ভবিষ্যৎ ছিল, এখন তাহা বর্ত্তমান। ইহজন্মের পর এখন যাহা পরলোক, তাহাই স্বলোক হইবে। আমরা সকলেই পথিক। পান্থশালায় কেহই চিরদিন থাকেনা। সর্ব্বদাই আমাদিগকে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। গাঁঠরী বোস্কা গোছাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

যাহার গোছান না থাকে, তাহার যাইবার সময় বড় কষ্ট হয়, অনেক ছাড়িয়া যাইতে হয়। কাহারও সহিত বৈরী, বিরোধ, কাহারও সহিত মনান্তর করিতে নাই। গাড়ীতে চলিবার সময় একটু অসুবিধা হইলে তাহা সহ্য করিতে হয়। মনে রাখিতে হয় যে, কিছু দূর যাইযাই ত নামিয়া যাইব। এ সংসারকে ঘরবাড়ী মনে করিতে নাই—তাহা হইলে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইবে। পান্থশালাকে কিম্বা ষ্টেশনকে কি কেহ ঘরবাড়ী মনে করে?"

এই সময় ডাক্তার বাবু প্রশ্নে বাধা পাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন,"পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কার্য্য এ জন্মে ভোগ করিতে হয়—এজন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে। কেহ বৃশ্চিকের খাঁঠরী বাঁধিয়া আনিলে গাঁঠরী খুলিবা মাত্র তাহাকে বৃশ্চিকে দংশন করে। যাহারা পূর্ব্বজন্মে ভাল কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা সুখ ভোগ করে। যাহারা পাপ ও অন্যায় করিয়া আসিযাছে, তাহারা দুঃখ ভোগ করে। ইহজন্মে যেমন কর্ম্ম করিবে, পরজন্মে আবার সেইরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিবে। এজন্য অনাসক্ত এবং ত্যাগী হইয়া সংকাজ করিবে, পরজীবনে মঙ্গল হইবে।"

প্রশ্ন (ডঃ বাবু)। শান্তি কি রূপে আসিবে?
উত্তর (স্বামী)। ভক্তি, বিশ্বাস এবং আস্তিক্য শান্তির প্রধান উপায়।

প্রঃ। একই ব্যক্তির কখনও বিশ্বাস এবং সদিচ্ছা আসে, আবার কখনও আসে না, ইহার কারণ কি? আমাদের অনেকেরই এইরূপ হয়।

উঃ। আমাদের নিজের কিছুই নাই। আচার এবং ভাষা প্রভৃতি অনুকরণ মাত্র। জন্মমাত্র আমাদের ভাল মন্দ কোন কাজই থাকে না, যেমন লোকে শিখাইবে ও যেমন শ্রুতিতে প্রবেশ করিবে, সেইরূপ ভাষা শিখিব এবং যেরূপ দেখিব ও শুনিব, অনুকরণে সেইরূপ আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি অভ্যাস হইবে। এই হেতু সংসঙ্গ করা উচিত। অসংসঙ্গে মনের উপর অসং কার্য্যের ছায়া পড়িবে, সংসঙ্গ করিলে সংকার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে এবং তদনুযায়ী অভ্যাস জন্মিয়া যাইবে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে লোকে সকল বিষয়েই শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিত। এখন আহার পর্য্যন্ত পরীক্ষা করাইয়া ভক্ষণ করে। ফারসী ও ইংরাজী আসিয়া সমস্ত টলটলায়মান। কোন বিষয়েই এখন স্থির বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। মন সর্ব্বদাই মথিত, কিন্তু ননী মাথনের খোজ খবর নাই। পরলোকে আস্থা নাই, আস্তিক্য নাই, পরমেশ্বরে বিশ্বাস নাই, শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই। এই জন্যই এত অশান্তি। আমাদের কিছুই নয়—সদভ্যাস সংসঙ্গে শিখিযাছি। অসদভ্যাস অসংসঙ্গে শিখিয়াছি। সদসংসঙ্গ যাহার কিছুই হয় নাই, সে কাষ্ঠবৎ।"

প্রশ্ন। (ডাঃ বাবু) তবে সংসঙ্গেও আমাদের সদিচ্ছা হয় না কেন?

বিদ্যার্থী বলিলেন, ইনি আপনার কথার খণ্ডন করিতেছেন না, মণ্ডন করিতেছেন। আপনি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলের কথা কহিয়াছেন, ইনি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

স্বামীজী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ঠিক হ্যায়। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার আমাদের বাসনা। যেমন ঘুম হইতে উঠিয়া আমরা সংস্কার ও অভ্যাস বশতঃ সাংসারিক কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, সেইরূপ বাসনার অধীন হইয়া আমরা জীবনে কর্ম্ম করি। বাসনা সুষুপ্তাদি চারি

প্রকার। যে যেমন কাজ করে, সে সেইরূপ স্বপ্ন দেখে। গৃহী গৃহস্থালীর, চোর জেল থানার, সাধু সাধুসঙ্গমের স্বপ্ন দেখে। আমাদের পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস বা সংস্কার এজন্মে বাসনা রূপে লুপ্ত অবস্থায় থাকে। অবসর, সুযোগ ও অনুকূল অবস্থা পাইলে প্রকাশ পায়।

এক সাধুর একটী বিড়াল ছিল। তাহার মাতা দুইটী ছানা প্রসব করিয়াই মরিয়া গিয়াছিল। একটী বিড়ালছানা অল্পক্ষণ পরেই মরিয়া গেল। অপরটী সাধু প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শাবকটী চক্ষু ফুটিলে আর তাহার জননী বা ভাইকে দেখিল না। সে দুধ ভাত খাইতে শিখিল। সত্রে সাধুদিগের ভোজনকালে সেও এক পাতায় বসিত। ক্রমে বিড়াল সাধু হইয়া গেল। একদিন দুধ খাইতে খাইতে সে হঠাৎ একটী ইন্দুর দেখিতে পাইল। বিড়াল-শিশু তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুধ ছাড়িয়া এক লম্ফে ইন্দুরের উপর পতিত হইল এবং তাহাকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিল; সাধুদিগের নিষেধ ও বাধা গ্রাহ্য করিল না। ইহা সংস্কার। গোবৎস জন্মমাত্রই গিলিত চর্ব্বণ করে, উট কণ্টক ভক্ষণ করে। উহাদিগকে তাহা শিখাইয়া দিতে হয় না। অনেকে সাধুসঙ্গে থাকিয়াও বিশেষ ফল লাভ করিতে পারে না।

বাসনার বিষয় উপস্থিত হইলে সুপ্ত বাসনা জাগরিত হয়। এজন্য সৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। তাহাতে সাধু বাসনার বিকাশ হয়, অসৎ বাসনা সবল সুপ্ত রহিয়া যায়। মহাপুরুষদিগের জীবনী আলোচনা করাও সাধু বাসনা জাগাইবার অন্যতর উপায়। কাশীতে এক ব্রাহ্মণের চারি পুত্র ছিল। চারিপুত্র হইয়াছিল—আর আর সকলেই অপুত্রক। এই চারি পুত্র পিতামাতার অত্যন্ত যত্ন সত্ত্বেও সকলেই ভ্রষ্টাচার ও অসৎস্বভাব বিশিষ্ট হইয়াছিল?

প্রশ্ন। (ডাঃ বাবু) মনুষ্য জন্মের পর কি পশু জন্ম হইতে পারে?

উঃ— "হাঁ, শাস্ত্রে আছে, মনুষ্য দেবতাও হইতে পারে, পশুও হইতে পারে। পশু সুখদুঃখ ভোগ করে, কিন্তু কর্ম্মফল ভাগী হয় না। শাস্ত্রকার বলেন, কীটপতঙ্গ বৃক্ষাদি ও বালকেরা কর্ম্মফল-ভাগী নহে। কেবল মনুষ্যই পাপপুণ্যের জন্য দায়ী। তবে তাহাদের সুখদুঃখের কারণ কি! তাহারা মনুষ্যজন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহারই ফলে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে এবং সুখদুঃখ ভোগ করে। ভোগ শেষ হইলে পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে পারে। কিন্তু সংস্কার ও বাসনা পশুর ন্যায় রহিয়া যাইবে। সুতরাং পুনরায় পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি যোনি প্রাপ্তি হইবে। যেমন চোরকে জেলখানা হইতে ছাড়িয়া দিলে সে আর কোন কাজ না শিখিয়া থাকিলে আবার চুরি করিয়া জেলেই যাইবে।

যে সকল লোক অন্যায় ও পাপ করিতে লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহারাই নর-দেহে পশু। মানুষ এজন্মেই পশু হইয়া পরে পশুজন্ম গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে এই জন্মে দেবতা হইয়া পরে দেবযোনি প্রাপ্ত হয়।

কাহারও মন্দ করিলে নিজেরই মন্দ করা হয়। পাপ কার্য্য ব্যতীতও অভ্যাস এবং কর্ম্মসংস্কার আমাদিগকে পরলোকে কুপথে লইয়া যায়। কাহারও ভাল করিলে, সে নিজেরই ভাল করা হয়। অতএব অপরের

রই ভাল মন্দ করে। ভাল মন্দ সকল কাজেই নিজের ভাল মন্দ করিতেছি, মনে করিতে হইবে এবং মানুষেব প্রতিও সাংসারিক বিষয়েব প্রতি বৈরিভাব ও মমতা, দুইই হ্রাস করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে বিষয়েব প্রতি ভালবাসা যতই কমিতে থাকিবে, ভগবানেব প্রতি অনুরাগ ততই বাড়িতে থাকিবে।"

মঙ্গলনাথ নীরব হইলেন। বেলা ১০॥০ টাব উপব হইয়াছিল। আমরা প্রণাম করিয়া উঠিলাম। উঠিবাব কালে স্বামীজী জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'ইহাঁ কেত্‌নে দিন রহোগে?' ডাঃ বাবু বলিলেন 'আজ রাত্‌কো জায়েঙ্গে।' আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম,গ্রীষ্মেব সময় মহারাজ হৃষীকেশ কিম্বা কঙ্খালে থাকিবেন কি না। স্বামী উত্তব কবিলেন, "কুছ নিশ্চয় নহী হ্যায়।"

সেই দিন কারণ বশতঃ আমাদেব আসা হইল না। স্বামী মঙ্গলনাথেব সহিত দেখা হইয়াছে, তিনি উপদেশ করিয়াছেন, শুনিয়া সন্ধ্যাবেলা আশ্রমেব অনেকে আমাদিগকে ঘিরিয়া বসিলেন। যাঁহারা মঙ্গলনাথ স্বামীব কথা শুনিতে আসিলেন, গুরুদাস স্বামী তাঁহাদেব অগ্রণী। গুরুদাস স্বামী ওলন্দাজ বংশীয়, আমেরিকাবাসী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া, পিতাব অতুল ঐশ্বর্য্যেব মায়া ত্যাগ করিয়া, রামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্ম-সাধনাব নিমিত্ত ভারতে আসিয়াছিলেন। পিতা সমস্ত সম্পত্তি হইতে গুরুদাসকে বঞ্চিত করিলেও আসিবার কালে তাঁহাকে ২৫০০০্ মুদ্রা গ্রাসাচ্ছাদনেব জন্য দান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী গুরুদাস ভারতে আসিয়া সকল অর্থ একটী গুরুভাইয়ের হস্তে প্রদান করিয়া সাধুবেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তাঁহার গৈরিক বাস, কাষ্ঠপাদুকা ও সিংহলী কমণ্ডলু তাঁহার গৌর কান্তির সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। গুরুভাই বহুদিন পর তপোবিঘ্ন হয় বলিয়া গুরুদাসের অর্থ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। স্বামী গুরুদাস তাহা পরোপকার ও সাধুসেবায় ব্যয় করিয়া স্বয়ং সত্রে কিম্বা মধুকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিনয়নম্র সরলতা-পূর্ণ গুরুদাস সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Doctor, did you see Mangalnath Swami? What did he say?" ডাক্তাব বাবুর সঙ্গে কথা হইল, মঙ্গলনাথের প্রশংসা হইল, তাহাতে আমিও যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গুরুদাস তাঁহার উপদেশ জানিতে চাহিলে ডাক্তারবাবু দুই চারি কথা বলিয়া আমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি যতদূর মনে ছিল, আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। গুরুদাস বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন এবং শেষে প্রশ্ন করিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, মানুষজন্মেব পর জীবাত্মা আর নীচজন্ম গ্রহণ করে না। মঙ্গলনাথ অন্যরূপ বলিতেছেন। এই উভয় মতেব সামঞ্জস্য কি রূপে হইতে পারে? এ প্রশ্ন আমাদেব মনে পূর্ব্বে উঠে নাই, সুতরাং স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। পুনরায় তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করা সকলেব মত হইল, আমার আপত্য টিকিল না। আমি বলিয়াছিলাম, স্বামীজী শাস্ত্রানুসারে উপদেশ দিয়াছেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ মতান্তরেব সামঞ্জস্য তিনি করিতে যাইবেন কেন? গুরুদাস মন্তব্য করিলেন, বিবেকানন্দের ন্যায় আর কাহাকেও দেখিলাম না। তাঁহার উপদেশে সঞ্জীবতা ছিল, and he had much to give.

পরদিন অপরাহ্ণে ডাক্তারবাবু ও আমি

স্বামী মঙ্গলনাথের দর্শনে চলিলাম। ববিশাল-বাসী একটী যুবক ব্রহ্মচাবী উপনিষদেব শ্লোক বিশেষেব অর্থ ব্যাখ্যা কবাইতে, বগলে পুঁথি লইযা আমাদেব সঙ্গে চলিলেন। পূর্ব্বদিনেব সেই ঘবে খাটিযায় একজন বৃদ্ধ সাধু ছিলেন, অন্যান্য সাধুগণ তাঁহাব সম্মুখে ভিড জমাইযা দাঁড়াইযা ছিলেন। আমবা ভূমিষ্ঠ হইযা প্রণিপাত কবিলাম। তিনি মঙ্গলনাথ নহেন। পবে জানিতে পাবিয়াছিলাম, তিনি উত্তব কাশীব বিখ্যাত সাধু তপস্বীনাথ। মঙ্গলনাথ কোথায়, কেহই বলিতে পাবিল না। ক্ষুণ্ণ-মনে ফিবিবার পথে একজন হিন্দুস্থানী জিজ্ঞাসা কবিলেন, আমরা কি চাই। উত্তব শুনিযা তিনি বলিলেন, আমাব সঙ্গে আসুন। কতদূব যাইযা বিদ্যালযাশ্রমেব সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণেব ঈশানকোণে একটী বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, "উহার নীচে মঙ্গলনাথ স্বামী আছেন।"

মঙ্গলনাথ আতসী ফুলেব আত্মজন্মা জঙ্গলের মধ্যে আম্রবৃক্ষেব নিম্নে একখানা খাটিয়ায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে কয়েক জন সাধু বসিয়া সসম্মানে বাক্যালাপ কবিতেছিল। আমবা প্রণাম কবিলাম, তিনি বসিতে বলিলেন না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া শ্যামল তৃণেব উপব উপবেশন করিলাম। স্বামীজী একবার জিজ্ঞাসা কবিলেন "কল নহী গযে?" আমবা বলিলাম, 'আজ্ঞে যাওযা হয় নাই।' ১০।১৫ মিনিট পব তিনি উঠিযা চলিলেন, সাধুবাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, আমাদেব ব্রহ্মচাবীও আমা-দিগকে ফেলিযা চলিলেন। তিখন সন্ধ্যা হইযাছিল, বৃদ্ধ ডাক্তাববাবু আব যাইতে সাহস কবিলেন না। আমাদিগকে অগত্যা ফিবিতে হইল। ব্রহ্মচাবী বাত্রি প্রায় ৯টায় ফিবিযা আসিযা বলিলেন, উপনিষদেব এমন সবল, সুন্দব, পবিষ্কাব ব্যাখ্যা জীবনে কখনও শুনি নাই। নগবেব ধাবে লোকালয় হইতে দূবে বিজন স্থানে স্বামীজীব সহিত আলাপ কবিবাব অবসব পাইযাছিলাম।

সেই অবধি মঙ্গলনাথ স্বামীর আব দর্শন পাই নাই। এখনও তাঁহাব পবিত্র, প্রশান্ত, দেবোপম সৌম্যমূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে জাগিতেছে। এখনও তাঁহাব অমিয়বাণী ও মধুব উপদেশ কর্ণে ঝঙ্কাব দিতেছে, আর মনে হইতেছে, শাস্ত্রকাব যথার্থই বলিয়াছেন—

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরু যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধা জন্মসাফলমাপ্নুযাৎ॥

১৩।৩। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

শ্রীরসিকলাল রায়।

ভারতীয় বহুদেববাদ।

(ক) ধর্ম্ম-বিকাশেব স্তবভেদ।

সভ্যাসভ্য পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেণীব মানব-সমাজে প্রচলিত ধর্ম্ম সকলেব তুলনা কবিযা বিচার করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, একেশ্বরের অনুভূতি লাভ করিবার পূর্ব্বে মানব মণ্ডলীকে সোপানেব পর সোপান, এইরূপ বহু সোপান অতিক্রম কবিতে হইযাছিল। যদিও নিম্নতব সোপানেব মানব সমাজে উন্নত সমাজের লোক সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়, এমন কি, দেশ অথবা কাল বিশেষে সোপান

সকলের পরস্পর সংমিশ্রণও দৃষ্ট হয়, তথাপি সাধারণ ভাবে এ কথা সত্য যে, ভূগর্ভের স্তরভেদের ন্যায় মানব জগতে ধর্ম্মবিকাশের মোটামোটী চারিটী স্তর, এবং দেশ কাল ভেদে তাহাদের পরস্পরের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নতম সোপানের মানব সমাজ শিশুর তুল্য। শিশুগণ যেমন আপনাদিগের খেলার পুতুল প্রভৃতির মধ্যে প্রাণ কল্পনা করিয়া কখনও বা তাহাদিগকে সাদরে চুম্বন করে, কখনও বা ক্রোধ ভরে তাহাদিগকে প্রহারও করে, সেইরূপ, ধর্ম্মের নিম্নতম সোপানের অসভ্য মানবমণ্ডলীও ইতর প্রাণী, অথবা বৃক্ষ, অথবা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিকে মানুষের ন্যায়, অথবা ততোধিক শক্তিশালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব মনে করিয়া তাহাদের পূজা করে, যুদ্ধ বা বিপদ সময়ে তাহাদিগের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশায় আহারাদি ভোগ্য বস্তু দ্বারা তাহাদিগের সৎকার করে, এবং সে আশায় বঞ্চিত হইলে রোষ ভরে তাহাদিগকে প্রহার করে, অথবা বিসর্জ্জন করে। এই স্তরকে প্রাণবাদ (animism) বলা যায়। এই স্তরের মানবগণ আপনাদিগের পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের পূজা করিয়া থাকে।

সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ইহার নিদর্শন দৃষ্ট হয়, যেমন রোমীয়দিগের মেনিজ (manes) অথবা আমাদিগের অগ্নিষ্বাত্ত মরীচি প্রভৃতি সপ্তপিতৃগণ। জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকে জড় বস্তুর জড়ত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়, তখন তাহারা জড় পূজা হইতে বিরত হইয়া, জড়বস্তু হইতে পৃথক্ রূপে প্রত্যেক জড় বস্তুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাতা, অথবা জড় প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃদেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা করিয়া থাকে।

"যদন্নঃ পুরুষো রাজন তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ"

সেই সঙ্গে পূজকদিগের স্ব স্ব ভোগ্য অন্নই তাহাদের দেবতারও পূজোপকরণ রূপে কল্পিত হয়। এই স্তরকেই বহুদেববাদ (Polytheism) বলা যায়। আবার জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকে দেখিতে পায় যে, জড় বস্তু সকল, অথবা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সকল (১) উপকার্য্য উপকারক— যেমন চক্ষু এবং সূর্য্য বা অগ্নি এবং বায়ু, (২) কার্য্য-কারণ যেমন মাটী জলাদি উদ্ভিদের বা উদ্ভিদাদি জীবের স্থিতি-কারণ, এবং (৩) অঙ্গাঙ্গী যেমন নদী পর্ব্বতাদি এবং পৃথিবী,— ইত্যাদি বিবিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ। তখন লোকে তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণেরও পরস্পর মিলন কল্পনা করিয়া একেশ্বরবাদের দিকে আরও অগ্রসর হয়, যথা বৈদিক বিশ্বদেব এবং বৈদিক এবং পৌরাণিক হিরণ্য গর্ভের কল্পনা। সেই সঙ্গে আবার ইহাও দেখা যায়, লোকে যখন যে দেবতাতে বিশেষ আসক্ত হয়, সেই দেবতাকেই দেবগণের প্রধান বা দেবরাজ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে (Henotheism)। পরিশেষে জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে লোকে যখন প্রকৃততত্ত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়, তখন দেখিতে পায় যে, এই বিশ্ব সংসার একই জ্ঞান, একই ইচ্ছা, একই শক্তি দ্বারা নিয়মিত। এই শেষ সোপানের নাম একেশ্বরবাদ (Monotheism)। একেশ্বরবাদের ক্রমবিকাশেই আরও একটী উন্নততর স্তরের আভাস লাভ হয়, তখন দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত শত বিরোধ থাকিলেও সকলই একত্ব-সূত্রে গ্রথিত। আমাদের হস্তপদাদি যেমন আমাদের অধীন, সেইরূপ, এই বিশ্বও এক বিশ্বাত্মার অধীন, এই অশেষ বিচিত্রতা এবং বিরোধপূর্ণ বিশ্ব একই

পরমাত্মার "স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়ার" প্রকাশ ভেদ মাত্র। প্রাচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যে হেগেল্ (Hegel) এই উন্নততম সোপানের আভাস লাভ করিয়া ইহাকে বিশ্বের জৈবিক একত্ব (Organic unity) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান-দিগের মধ্যে সুফিগণ তাহা দর্শন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু বেদান্তেই এই সর্ব্বাত্মবাদের বিশেষ বিকাশ।

(খ) ঋগ্বেদে ধর্ম্ম-স্তবের নিদর্শন।

আমাদের ঋগ্বেদ ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের অনু-শীলন বিষয়ে আমাদের বিশেষ সহায়। ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটী স্তর, এবং তাহাদের পরস্পর সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদ-সংহিতাতে অতি সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়। আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে পাঠকের নিকটে তাহার দু-একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। (১) প্রাণবাদ, অথবা জড়ের প্রাণ কল্পনার দৃষ্টান্ত, যথা, সীতা অর্থাৎ লাঙ্গল-খনিত রেখার স্তবঃ—"হে সুভগে সীতে আমাদের অভিমুখিন হও। আমরা তোমার বন্দনা করিতেছি। তুমি আমাদের বাঞ্ছিত ধন এবং সুফল প্রদান কর।" ৪-৫৭-৬। জল ও নদীর স্তবঃ—"দেবী-রূপ জলকে আহ্বান করি, যাহা আমাদের গাভী সকল পান করে। যে জল সিন্ধুরূপে প্রবাহিত, তাহার জন্য হবিঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য।" ১-২৩-১৮। ঘৃতের স্তবঃ—"আমরা ঘৃতের নাম কীর্ত্তন করিব। এযজ্ঞে নমস্কার-দ্বারা তাহাকে ধারণ করিব।* ৪-৫৮-২। এতদ্ ভিন্ন মণ্ডূক বা ভেকের স্তব সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে দ্রষ্টব্য। পিতৃপুরুষদিগের স্তবে-রও দৃষ্টান্ত আমরা ঋগ্বেদে পাইতেছিঃ—"হে যম, এই যজ্ঞারম্ভে আসিয়া উপবেশন কর। অঙ্গিরা নামক পিতৃগণকে সঙ্গে আন। অঙ্গিরা, অথর্ব্বন্, এবং ভৃগু আমাদের পিতৃগণ আসিয়াছেন, তাহারা সোমপানের অধিকারী। সেই যজ্ঞে ভোক্তাগণ আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। তাহাদের প্রসন্নতা লাভ করিয়া আমরা কল্যাণ যুক্ত হই।"* ১০-১৪-৪,৬।

(২) *ঋগ্বেদে বহুদেববাদের (Polytheism) নিদর্শনেরও অভাব নাই। কোথাও বা তেত্রিশ জন দেবতার উল্লেখ "বিশ্বেদে বৈ—স্ত্রিভিরেকাদশৈঃ" (৩ × ১১ = ৩৩)। ৮—৩৫—৩। কোথাও বা তিন হাজার তিন শত উনচল্লিশ জন দেবতার উল্লেখ— "ত্রিনিশত ত্রীসহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন্"—'তিন সহস্র তিন শত ত্রিশ ও নয় জন দেবগণ অগ্নির পূজা করিলেন।' কোথাও বা সমস্ত দেবগণ একযোগে বিশ্ব-দেব নামে পূজিত হইয়াছেন, "ওমাসশ্চর্ষণী ধৃতো বিশ্বে দেবাস আগত"—'হে কৃষকদিগের পালক বিশ্বদেবগণ, আগমন কর।' ১-৩-৭। আবার কোথাও বা বরুণ (৫ ৮৫ সূক্ত), কোথাও বা ইন্দ্র (২-২২-১), কোথাও বা অগ্নি (৩-৫৫-৪) সমস্ত দেবগণের রাজা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন, (Henotheism)। পরিশেষে আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিদিগের মনে দেবগণের শক্তিতে, এমন কি, অস্তিত্বে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের উদয় হই-

---

* (১) অর্ব্বাচী সুভগে ভব সীতে বংদামহেত্বা। যথা নঃ সুভগা মসি যথা নঃ সুফলা মসি—৪" ৪-৫৭—৬। অপোদেবী রূপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি। সিংধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ১১ ২৩ ৮। বয়ং নাম প্রব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ ৪-৫৮-২।

(২) "ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাংগিরো ভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ॥" অংগিরসো, নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বানো ভৃগবঃ সোম্যানঃ। তেষাংবয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়া নামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।" ১০-১৪-৪৬॥

আছে। "অস্তি স্বিগ্নু বীর্য্যং তত্র ইন্দনস্বিদস্তি" 'হে ইন্দ্র তোমার সে প্রকার শক্তি কি আছে না নাই।' ৬-১৮-৩। যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ নেতি ঘোরমুতেমাত নৈ যো অস্তীত্যেনং॥" 'সেই ভয়ঙ্কর (দেব) যাঁহার সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, 'তিনি কোথায়,' এবং কেহ বলে 'তিনি নাই।' ২-১২-৫। "নেন্দ্রোস্তীতি নেম উত্ব অহে কইং দদর্শকমভিষ্টকম"। 'নেম (ঋষি) বলেন, ইন্দ্র নাই, কে তাহাকে দেখিয়াছে, আমরা কাহার স্তব করিব?'

(৩) ঋগ্বেদে আমরা ঈশ্বরের একত্বের (monotheism) অনুভূতিরও বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। "মহৎ দেবানামসুরত্বমেকং" 'দেবগণের মহাশক্তি একই'। ৩-৫৫-১। আবার এক অগ্নিকেই বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবগণ রূপে সম্বোধন করা হইতেছে:—"হে অগ্নি, তুমিই জন্মিয়া বরুণ হও, প্রজ্বলিত হইয়া মিত্র হও, হে বলের পুত্র, তুমি বিশ্বদেবগণ, তুমিই হব্যদাতা লোকের নিকটে ইন্দ্র।" ৫-৩-১। * আমরা প্রথম মণ্ডলেই ইহাও দেখিতে পাই যে, বৈদিক ঋষি লৌকিক বহুদেববাদে অতৃপ্ত। ঈশ্বর বিষয়ে আপনার অজ্ঞানতা অনুভব করিয়া ঋষি দুঃখ করিতেছেন, ঈশ্বর যে এক এবং জন্মরহিত, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছেন। ঋষি বলিতেছেন:—"প্রথমজায়মানকে (যিনি প্রথমে বিশ্বরূপে আবির্ভূত) কে দেখিয়াছে—যিনি স্বয়ং অস্থিশূন্য হইয়া অস্থিযুক্তকে ধারণ করেন। প্রাণ ও শোণিত ভূমি হইতে, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? বিদ্বানের নিকটে কে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল? আমি অজ্ঞানী, মন দ্বারা ধারণ করিতে পারি না। এই সকল প্রশ্ন দেবগণের নিগূঢ়। আমি অজ্ঞানী, জানিনা, তাই জানিবার জন্য বিদ্বান্ কবিদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—"যিনি ছয় লোককে স্তম্ভিত করিয়া আছেন, সেই জন্মরহিতের রূপ কি এক?" ২-১৬৪-৪, ৫, ৬॥ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই দেখা যায়, বৈদিক ঋষির হৃদয়ে ঈশ্বরের একত্ব বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দশম মণ্ডলের ৮১ সূক্তে—(যাহার দেবতা বিশ্বকর্ম্মা, ঋষিও বিশ্বকর্ম্মা) বিশ্বকর্ম্মা নামে ঈশ্বরকে এক বলা হইতেছে, আমাদের পিতা বলা হইতেছে, ঋষি বলা হইতেছে, এবং বিশ্বভুবনকে এক মহাযজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া তাহার হোতা বা হোম কর্ত্তা বলা হইতেছে:— "দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ"। "য ইমা বিশ্বভুবনানি জুহ্বদৃষি র্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ"। বিশ্বকর্ম্মা "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ"। ঐ মণ্ডলের ৮২ * সূক্তেরও দেবতা এবং ঋষি বিশ্বকর্ম্মা।

---

* "ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।
ত্বে বিশ্বে সহসসপুত্র দেবা ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায়॥ ৫-৩-১।

* বিশ্বকর্ম্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদংতি যত্রা সপ্ত ঋষীন্পর এক আহুঃ। ২॥
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানিবেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এবতং সংপ্রশ্নংভুবনা যংত্যন্যা॥ ৩॥
পরো দিবা পরএনা পৃথিব্যা পরোদেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।৪।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।৫।
তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছংতবিশ্বে।

ইহাতে সৃষ্টিবিষয়ক যে সূক্ষ্ম আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে বিংশ শতাব্দীর কুজ্ঝটিকা-বাদের (Nebulous theory)ও কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। "বিশ্বকর্ম্মার মন বৃহৎ, আত্মা বৃহৎ, তিনি ধাতা, বিধাতা, সকলের শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্বজ্ঞ। কেহ বলে, তিনি সপ্তঋষির পর-বর্ত্তী স্থানে একাকী আছেন। এস্থানে আমরা পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকদিগের তটস্থ ঈশ্বরবাদের, এবং খ্রীষ্টীয় কোন কোন সম্প্রদায়ের মতের কতক আভাস পাইতেছি। আবার বিশ্বকর্ম্মা সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—"যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা-রূপে বিশ্বভুবনের সকল স্থান অবগত আছেন, যিনি এক হইয়াও দেবগণের নাম ধারণ করেন, অপর সকল ভুবনের লোক তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে। যাহা দ্যুলোকের অতীত, পৃথিবীরও অতীত, অসুর দেবগণেরও অতীত, জল সকল, এমন কি, প্রথম গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, যাহার মধ্যে সমস্তদেবগণ আপনাদিগকে মিলিত দেখিয়া-ছিলেন? জল সকল সেই প্রথম গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, যাহার মধ্যে দেবগণ সকলে মিলিত, যাহা সেই জন্মরহিতের নাভিদেশে এক হইয়া অবস্থিত, তাহাতেই বিশ্বভুবনও অবস্থিত। তাহাকে তোমরা জাননা, যাহা হইতে এসকলের জন্ম। তোমাদের অন্তর অন্য প্রকার হইয়াছে। লোক সকল কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন-দৃষ্টি হইয়া নানাপ্রকার জল্পনা করে। তাহারা (আহারাদিদ্বারা) আপন প্রাণের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়া স্তবস্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে"। আবার দশম মণ্ডলের ১২১* সূক্ত, যাহার ঋষি হিরণ্যগর্ভ, এবং দেবতা 'ক' ("কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"—এই ঋগংশের প্রথম অক্ষর) নামে প্রজাপতি—তাহাতে উক্ত হইতেছে:—"পূর্ব্বে এক হিরণ্যগর্ভ ছিলেন। তিনি জাতমাত্র ভূত সকলের একাধিপতি হইলেন। তিনিই দ্যাবা পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। হবির্দ্বারা কোন্ দেবতার পূজা করিব? যিনি আত্মা দান করেন, বল দান করেন, যাঁহার আজ্ঞা সমস্ত দেবগণ পালন করেন, অমৃত যাঁহার ছায়া-স্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার অধীন। কোন্ দেবতাকে হবি-র্দ্বারা পূজা করিব? যিনি স্বীয় শক্তিবলে ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত প্রাণীজগতের একমাত্র রাজা, যিনি এই দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সকলের নিয়ন্তা। হবিঃদ্বারা কোন্ দেবতার পূজা করিব? হে প্রজাপতি, তোমা ভিন্ন অন্য কেহ এই সৃষ্টবিশ্ব নিয়মিত করিতে পারে না।" আবার ১১৪ সূক্তে বলা হইতেছে:—"সুপর্ণ বা পক্ষী (পরমাত্মা) একই আছেন। জ্ঞানী পণ্ডিত-গণ তাঁহার একত্ব সত্ত্বেও বাক্যদ্বারা তাঁহাকে নানা রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন।"

(৪) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"এই সমস্তই ব্রহ্ম, কারণ তাহা হইতেই এসকলের উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি, এবং তাহাতেই এ সকলের লয়"—ইহাই সর্ব্বাত্মবাদের পরাকাষ্ঠা। যদিও

অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবানি তস্থুঃ। ৬।

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্য দ্যুষ্মাকমংতরং বভূব।
নীহারেন প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ
উক্থশাসশ্চরংতি" ।৭।১০ম ৮২সূক্ত।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ১।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ২।